দুঃসাহসী টম সয়্যার

মূলঃ মার্ক টোয়েন

রূপান্তরঃ রকিব হাসান

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৮৫

এক

'টম!'

সাড়া নেই।

'গেল কোথায় ছেলেটা? এইই টম্‌ম্‌!'

সাড়া নেই। চশমাটা নাকের ডগায় টেনে বসিয়ে ওপর দিয়ে তাকালেন পলি খালা। তারপর আঙুল দিয়ে ঠেলে ওপরে তুলে নিচে দিয়ে চাইলেন। এই চশমাজোড়া তার গর্বের বস্তু, পছন্দের জিনিস। টমের মতো নগণ্য একটা ছেলেকে খুঁজতে এতো দামী জিনিস ব্যবহারের দরকার নেই।

কোথাও দেখা গেল না টমকে। জোরে জোরে বললেন পলি খালা, 'যদি ধরতে পারি তোকে...'

কথা শেষ না করেই ঝুল পরিষ্কারের ঝাড়ুটা দিয়ে খাটের তলায় খোঁচাতে শুরু করলেন তিনি। কিন্তু পাত্তা নেই টমের। খোঁচা খেয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলো শুধু বিড়ালটা।

'নাহ্‌, ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা গেল না!' বিড়বিড় করতে করতে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন পলি খালা। বাইরে তাকালেন। না, বাগানেও নেই। গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'এ-ই-ই ট-ম্‌-ম্‌-ম্‌!'

পেছনে মৃদু আওয়াজ হতেই পাঁই করে ঘুরলেন পলি খালা। বেরিয়ে যাচ্ছিলো, শেষ মুহূর্তে টমের শার্টের কলার চেপে ধরে ফেললেন। 'এইবার ধরেছি। ওই আলমারির পেছনে কি করছিলি, হতভাগা?'

'কিছু না।'

'কিছু না? দেখি, তোর হাত দেখি? ও-মা, মুখেও লেগে আছে দেখো! কি মাখিয়েছিস?'

'কিছু না, খালা।'

'আবার বলছে কিছু না। ওহহো, বুঝেছি। জ্যাম! এই ছোঁড়া, হাজারবার না মানা করেছি জ্যাম ধরবি না? দাঁড়া, আজ তোর একদিন কি আমার! গেল কোথায়, আমার বেতটা গেল কোথায়!'

টমকে টেনেহিঁচড়ে বেতের কাছে নিয়ে গেলেন পলি খালা। তুলে নিলেন বেত। বাড়ি মারার জন্যে উঁচু করলেন

টমের সেদিকে খেয়াল নেই। পলি খালার পেছন দিকে চেয়ে বলে উঠলো,

'দেখো খালা, দেখো, দেখো!'

চমকে পেছনে ফিরে চাইলেন খালা। একটু ঢিল পড়লো ধরায়, এই সুযোগে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েই দৌড় মারলো টম। এক দৌড়ে দরজা পেরিয়ে বাগানে। বাগান পেরিয়ে বেড়া টপকে একেবারে ওপাশে।

অবাক হয়ে এক মুহূর্ত সেদিকে চেয়ে রইলেন পলি খালা। ধীরে ধীরে সস্নেহ একটা হাসি ফুটলো ঠোঁটে। 'নাহ্, ছেলেটার সঙ্গে আর পারলাম না! এই নিয়ে কতোবার এমনি করে ঠকালো আমাকে!' ভাবছেন তিনি। 'কিন্তু কি করবো? এক চালাকি দু'বার করে না ছোঁড়াটা। কখন যে কোন ফন্দি মনে আসে তার, ঈশ্বরই জানেন! ঈশ্বর, ছেলেটাকে তুমি ভালো করে দাও। মরা বোনের ছেলে আমার। টমকে ভালো করতে না পারলে মরা বোনের কাছে কি জবাব দেবো? ছেলেটাকে মারতেও মন চায় না। কিন্তু যে হারে বেয়াড়া হয়ে উঠছে দিন দিন না মেরেই বা কি করি! ঠিক আছে, আর মারবো না। তবে শাস্তি দেবোই, অন্যভাবে। আগামীকাল শনিবার, স্কুল ছুটি। ছেলেরা যখন খেলবে, তোকে কাজ করাবো আমি! সারাদিন কাজ করাবো। এভাবে বখে যেতে দেবো না আমি তোকে। কিছুতেই না,' মনস্থির করে নিয়ে ঘরের কাজে মন দিলেন খালা।

সারাটা দিন মৌজে কাটিয়ে রাতের খাবারের আগে ঘরে ফিরলো টম।

খেতে বসেছে টম। সিডও বসেছে। সে টমের ভাই। এতো দুরন্ত না। পলি খালার কথা শোনে, ঠিকমতো স্কুলে যায়। লক্ষ্মী ছেলে।

পাশে বসে দু'ভাইকে খাওয়াচ্ছেন পলি খালা। কথার প্যাঁচে ফেলে টমের কাছ থেকে আসল কথা আদায় করতে চাইলেন। 'টম, স্কুলে গিয়েছিলি তো?'

'হুঁ,' টম অন্যমনস্ক। চিনি চুরি করার তালে আছে।

'খুব গরম পড়েছিলো আজ।'

'হুঁ।'

'খুব বেশি গরম?'

'হুঁ।'

'সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করেনি?'

হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠলো টম। চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকালো খালার দিকে। নাহ্, খালার মুখ নির্বিকার। ভয়ের কিছু নেই। 'না...হ্যাঁ, করেছিলো। কম।'

টমের মাথায় হাত রাখলেন পলি খালা। 'তোর চুল ভিজে ভিজে কেনরে, টম?' মনে মনে বললেন, 'কেমন মজা। এবার কি বলবে, বাছাধন?'

'শুধু চুলই ভেজা, খালা, গা তো শুকনো। গরম সইতে না পেরে মাথায় পানি দিয়েছিলাম।'

চুপসে গেলেন খালা। ফাঁদে পড়লো না ছেলেটা। ঠিক একটা জবাব দিয়ে দিলো।

'টম, মাথায় পানি দিতে নিশ্চয় শার্ট খুলতে হয়নি তোকে? খোলার দরকারও পড়ে না। দেখি, খোল তো দেখি জ্যাকেটের বোতাম?'

দুশ্চিন্তার সামান্য ছোঁয়া যা ছিলো, দূর হয়ে গেল টমের চেহারা থেকে। নির্দ্বিধায় জ্যাকেট খুলে ফেললো সে। দেখালো, শার্টের কলারে সেলাই ঠিকই

আছে। দু'দিকের কলার এক করে সেলাই করে দেন পলি খালা। ওই সেলাই না ছিঁড়ে শার্ট খোলা যাবে না।

'নাহ, ঠিকই আছে সেলাই,' পুরোপুরি হতাশ হয়েছেন পলি খালা। 'শার্টও শুকনো। তার মানে নামিসনি পানিতে। ঠিক আছে, টম, সকালের কথা ভুলে যাচ্ছি। মাফ করে দিলাম এবার। পরের বার আর ছাড়বো না।'

হতাশ হলেন, আবার খুশিও হলেন খালা। যাক, তার একটা কথা অন্তত রেখেছে ছোঁড়াটা। পানিতে নামেনি।

'খালা!' টমের কলারের দিকে চেয়ে আছে সিড। 'কলার আটকেছিলে সাদা সুতো দিয়ে। এখন দেখা যাচ্ছে কালো!'

'তাই তো! সাদা সুতো দিয়েই তো লাগিয়েছিলাম! টম!'

কিন্তু টম ততোক্ষণে দরজার কাছে। ফিরে চেয়ে শাসালো, 'সিডি, মজা দেখাবো আমি তোকে!' বলেই বেরিয়ে এলো সে।

নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে জ্যাকেট উল্টে দেখলো। দু'টো সুচ গাঁথা রয়েছে। একটায় কালো সুতো পরানো, আরেকটায় সাদা। বিড়বিড় করলো টম, 'সিডি হারামজাদা না বলে দিলে টেরই পেতো না খালা! আর খালারও যা কাজ! কখনো কালো সুতো, কখনো সাদা...কতো মনে রাখা যায় কখন কোন্‌টা দিয়ে সেলাই করলো? যাক গে! কিন্তু সিডকে ছাড়বো না! মওকা পেলেই দেখাবো।'

গাঁয়ের লক্ষ্মী ছেলে নয় টম। তাই লক্ষ্মী ছেলেদের দু'চোখে দেখতে পারে না, হোক না সে তারই ভাই।

কিন্তু দু'মিনিটেই সব ভুলে গেল টম। হাঁটতে শুরু করলো। শিস দিচ্ছে আপনমনে। ভাবছে, পৃথিবীটা খুব খারাপ জায়গা। এরচেয়ে ভালো কোন একটা গ্রহে যদি যাওয়া যেতো! যেখানে আছে পূর্ণ স্বাধীনতা।

গ্রীষ্মের দিনগুলো বড় দীর্ঘ। অন্ধকার হয়নি এখনো। হঠাৎ শিস থেমে গেল টমের। তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। এ অঞ্চলে, সেইন্ট পিটার্সবার্গের এই দরিদ্র গাঁয়ে নতুন। আগে কখনো ছেলেটাকে দেখেনি টম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দামী বেশভূষা। মাথার টুপিটাও নতুন। ওর পরিচ্ছদের তুলনায় নিজেরগুলো অনেক বেশি পুরোনো আর নোংরা মনে হলো টমের। কাজেই খেপে গেল ছেলেটার ওপর।

টমের চাউনি দেখেই বুঝলো ছেলেটা, গতিক সুবিধের নয়। সতর্ক হয়ে উঠলো সে।

দুজনেই নীরব। এক পর্যায়ে দুজনেই দুজনকে সামনে রেখে ঘুরতে শুরু করলো। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো টম, 'তোকে ধরে পেটাতে পারি, জানিস?'

'দেখনা, চেষ্টা করে।'

'পারি।'

'না।'

'হ্যাঁ, পারি।'

'না।'

'পারি।'

'না।'
'পারি!'
'না!'
এক মুহূর্ত থমথমে নীরবতা। টম বললো, 'কি নাম তোর?'
'তা দিয়ে তোর কি দরকার?'
'কি দরকার দেখাবো?'
'দেখা না।'
'বেশি কথা বললে দেখাবোই তো।'
'বলঘো বেশি কথা। একশোবার বলবো। কি করবি?'
'নিজেকে খুব চালু মনে করিস, না? চাইলে এক হাতেই তোকে চিত করে ফেলতে পারি।'
'খালি তো বলছিস পারি পারি! করে দেখা না।'
'বেশি বাড়াবাড়ি করলে করবো।'
'কতো দেখলাম, সব এক!'
'বড় বেশি চালবাজি দেখাচ্ছিস! এহ্, যা একখানা হ্যাট লাগিয়েছিস মাথায়!'
'পছন্দ না হলে ফেলে দে না দেখি, কেমন পারিস? মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেয়া আছে হ্যাটে। ছুঁলেই মরবি।'
'মিথ্যুক কোথাকার!'
'তুই কি কম?'
'তুই তো মিথ্যের ডিপো।'
'হয়েছে হয়েছে। এখন ভাগ এখান থেকে।'
'কাকে কি বলছিস? ইট দিয়ে দেব এক বাড়ি মাথায়।'
'এহ্, কি আমার বাহাদুররে!'
'দেখ, ভালো হবে না বলছি!'
'খারাপটা কি করবি কর না? কলজে ধুকপুক করছে, বড় বড় কথা।'
'না, আমি ভীতু নই!'
'হ্যাঁ, ভীতু।'
'না!'
'হ্যাঁ।'
আবার নীরবতা। প্রথমে চোখাচোখি, একে অন্যকে ঘিরে ঘোরাঘুরি তারপর কাছাকাছি। দুজনের কাঁধে কাঁধ ঠেকে গেল, ঠেলাঠেলি চললো খানিকক্ষণ। শেষে টম বললো, 'ভাগ এখান থেকে!'
'তুই যা না।'
'আমি যাবো না।'
'আমিও না।'
ঠেলাঠেলি করে কেউ কাউকে হটাতে পারলো না। সরে এলো দুজনেই। মুখোমুখি দাঁড়ালো। দুজনেরই একটা পা সামনে বাড়ানো, লড়াইয়ের ভঙ্গি। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। চোখে সতর্ক দৃষ্টি।

'তুই একটা ভীতুর ডিম। আমার বড় ভাইকে বলবো, কড়ে আঙুলেই শায়েস্তা করে দেবে তোকে।'

'তোর ভাইয়ের পরোয়া করি নাকি আমি? ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে আমার ভাই।'

(দুজনের কারওই বড় ভাই নেই।)

'মিথ্যে কথা!'

'তুই তো খুব সত্যি বলছিস?'

পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে সামনের বালিতে একটা দাগ টেনে দিলো টম। 'এই দাগের এপাশে এলেই দেখাবো মজা। পিটিয়ে তক্তা করবো।'

নির্দ্বিধায় দাগের এপাশে চলে এলো ছেলেটা। 'কর তো তক্তা?'

'দেখ, আমাকে বেশি রাগাবি না!'

'রাগালাম তো। কি করলি?'

'করবো, তবে খামোকা না। দু'সেন্ট পেলে।'

পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলো ছেলেটা। সামনে বাড়িয়ে দিলো হাত। মুঠো খুললো। দুটো তামার মুদ্রা হাতে।

এক থাবায় মুদ্রাদুটো মাটিতে ফেলে দিলো টম। পরক্ষণেই দেখা গেল, একে অন্যকে জড়িয়ে ধরেছে। জড়াজড়ি, তারপর মাটিতে গড়াগড়ি। সুযোগ পেলেই একজন আরেকজনের চুল ছিঁড়ছে, কাপড় টানছে, খামচাখামচি কিলাকিলি করছে সমানে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ছেলেটার বুকে চেপে বসেছে টম। দু'হাতে কিল মারছে শত্রুর মুখে। খানিকক্ষণ কিলিয়ে নিয়ে বললো, 'ওস্তাদ মান! ছেড়ে দেবো।'

জবাবে জোর করে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলো ছেলেটা। পারলো না। কেঁদেই ফেললো রাগে, ক্ষোভে।

আবার কয়েকটা কিল মারলো টম। 'এখনো ওস্তাদ মান। নইলে ছাড়ছি না।'

শেষ পর্যন্ত ওস্তাদ মানতেই হলো। ছেলেটার বুকের ওপর থেকে নেমে এলো টম। 'কিছুটা শিক্ষা হলো তো? আর কোনদিন বেয়াদবি করলে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবো।'

করুণ চোখে নিজের ধুলোমাখা, ছিঁড়ে যাওয়া পোশাকের দিকে তাকালো ছেলেটা। ফোঁপাচ্ছে। পানি টলমল করছে চোখের কোণে। হাত দিয়ে ঝেড়ে কোটের ধুলো পরিষ্কারের চেষ্টা করলো। ফোঁপাতে ফোঁপাতেই আঙুল তুলে টমকে শাসালো, 'দাঁড়া, আরেকদিন মজা দেখাবো তোকে!'

তেড়ে এলো টম। ঘুরে দৌড় মারলো ছেলেটা। তাড়া করে নিয়ে গেল টম। কিন্তু দৌড়ে পেরে উঠলো না ছেলেটার সঙ্গে। আবার ধোলাই খাবার ভয়ে ঝেড়ে দৌড়াচ্ছে সে।

ছাড়ার পাত্র নয় টম। তাড়া করে ছেলেটাকে তার বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেল। এক ছুটে গেটের ভেতর ঢুকে পড়লো ছেলেটা। ঘরে ঢুকে একটা জানালা দিয়ে উঁকি দিলো। মুখ ভেঙচাতে লাগলো টমকে। ছেলেটার পাশেই উঁকি দিলো তার মায়ের মুখ। শাসালো টমকে। ভাগতে বললো।

বিশ্বাসঘাতক শত্রুর বিরুদ্ধে এখন আর কিছুই করার নেই। সরে এলো টম।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল। নিঃশব্দে জানালার চৌকাঠে উঠে বসলো টম। চুপিচুপি নেমে গেল ওপাশে। থমকে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গেই। বসে আছেন পলি খালা।

জ্বলন্ত চোখে টমের দিকে তাকালেন পলি খালা। টমকে আর মারবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। তবে শনিবারে কাজ থেকে রেহাই নেই। কিছুতেই খেলতে দেয়া হবে না টমকে। হাড়ভাঙা কাজের ভার দেবেন তার ওপর, এই সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেললেন।

দুই

শনিবার সকাল। বাইরে গ্রীষ্মের উজ্জ্বল রোদ, তাজা বাতাস। প্রাণচঞ্চল গ্রাম। লোকের হৃদয়ে খুশির আমেজ, গান হয়ে ফুটে বেরোচ্ছে অনেকেরই গলা দিয়ে। কুঁড়ি ধরেছে লোকাস্ট গাছগুলোতে, বাতাসে ভুর ভুর করছে মিষ্টি সুবাস। গাঁয়ের ওপাশের কার্ডিফ পাহাড় ঢেকে গেছে সবুজে সবুজে। কেমন এক অদ্ভুত আকর্ষণ জাগাচ্ছে দর্শকের মনে, ছুটে গিয়ে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানাচ্ছে যেন পাহাড়টা।

একটা বড় বালতিতে গোলানো সাদা রঙ আর লম্বা হাতলওয়ালা একটা ব্রাশ নিয়ে ঘর থেকে বেরোলো টম। বেড়ার বাইরের দিকে এসে দাঁড়ালো। বিষণ্ন চেহারা। নয় ফুট উঁচু, তিরিশ গজ লম্বা কাঠের বেড়াটার দিকে চাইলো একবার। দুনিয়াটা অর্থহীন হয়ে গেল নিমেষে। ব্রাশটা চোবালো বালতিতে। তুলে বেড়ার ওপরের দিকটায় এক পোঁচ লাগালো। আবার ব্রাশটা রঙে চুবিয়ে তুলে আবার ঘষা দিলো বেড়ায়। পাশে ফিরে চাইলো একবার, বেড়ার শেষ প্রান্তের দিকে। পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়লো। এসে বসে পড়লো একটা গাছের বেরিয়ে থাকা শেকড়ে।

গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো পলি খালার নিগ্রো চাকর জিম। হাতে একটা বালতি। পানি আনতে যাচ্ছে রাস্তার ধারের কল থেকে। গুনগুন গান ধরেছেঃ 'বাফেলো গালস (গার্লস)...'

পানি আনার কাজটা চিরকালই ঘৃণার চোখে দেখেছে টম। আজ মনে হলো এটাও একটা ভালো কাজ। অন্তত বেড়ায় রঙ দেয়ার চেয়ে তো বটেই। কলের ধারে অনেক ছেলেছোকরা আছে। কথা বলা যায়, ঝগড়া করা যায়, চাইলে মারপিটও বাধানো যায়। অনেক উত্তেজনা ওখানে।

ডেকে বললো টম, 'জিম, বালতিটা আমাকে দে না। আমি পানি নিয়ে আসি। তুই ততোক্ষণে বেড়ায় একটু রঙ লাগা।'

জোরে জোরে মাথা নাড়লো জিম। 'না, ভাই। মা তাহলে আস্ত রাখবেন না আমাকে। তোমাকে বিরক্ত করতে বারণ করে দিয়েছে! তুমি তোমার কাজ

করো।'

'দুত্তোর তার বারণ! আস্ত রাখবে না শুধু বলে, করে না কিছুই! তুই বালতিটা দে। এই যাবো আর আসবো। এক মিনিট। জানতেই পারবে না খালা।'

'নারে, ভাই, আমাকে মাফ করো। মা জানলে, আমি গেছি!'

'জিম, আমাকে বালতিটা দে ভাই। দিলে আমার বুড়ো আঙুলের কি অবস্থা হয়েছে দেখাবো তোকে।'

টমেরই সমবয়েসী জিম। এতো আকর্ষণীয় প্রস্তাবের পর আর মানা করতে পারলো না সে, কৌতূহল চেপে রাখতে পারলো না। পা টিপে টিপে এগিয়ে এলো। সবে ব্যাণ্ডেজ খুলতে শুরু করেছে টম, এই সময় পলি খালার পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন দুজনের শরীরেই। ঘুরেই ছুটলো জিম। এক লাফে বেড়ার কাছে চলে এলো আবার টম। সমানে ব্রাশ ঘষতে লাগলো বেড়ার গায়ে।

গেটের বাইরে উঁকি দিলেন পলি খালা। টমকে কাজ করতে দেখলেন। মৃদু হাসি ফুটলো তাঁর মুখে! ভাবখানা, কেমন মজা? দেখে চলে গেলেন তিনি।

কাজে আবার ঢিল পড়লো টমের। বেড়ার গায়ে ধীরেসুস্থে ব্রাশ ঘষছে, আর ভাবছে। ইস্, কতো কি প্ল্যান করে রেখেছিলো এই দিনটিতে করবে বলে! সব মাঠে মারা গেল। শিগগিরই খেলতে বেরোবে ছেলের দল। এখানেও আসবে। করুণার চোখে টমের দিকে তাকাবে ওরা। তারপর চলে যাবে খেলতে। অসহায়ভাবে চেয়ে চেয়ে শুধু দেখবে টম। যোগ দিতে পারবে না ওদের খেলায়। আচ্ছা, ওদের কাউকে দিয়ে কাজ করানো যায় না? কোন লোভনীয় জিনিসের বিনিময়ে? পকেটে হাত ঢোকালো টম। বের করে আনলো তার সব ঐশ্বর্য। খেলনার ভাঙা টুকরো, কয়েকটা মারবেল, আরো কিছু আজেবাজে জিনিস। জিনিসগুলো টমের কাছে যেমন, অন্যদের কাছেও সমান লোভনীয়ই হবে। কিন্তু জিনিস খুব কম। কাউকে আধ ঘণ্টাও ধরে রাখতে পারবে না টম এসবের বিনিময়ে। হতাশভাবে আবার ওগুলো পকেটে ভরে রাখলো সে।

প্রথমে এলো বেন রোজারস। আড়চোখে ওর ভাবসাব দেখেই বুঝে গেল টম, বেশ মউজে আছে। নাচতে নাচতে আসছে। বড় একটা আপেল হাতে, কয়েক কামড় খেয়েছে। দেখেই জিভে পানি এসে গেল টমের।

টমকে দেখতে পেয়েছে বেন। ব্যস, মিসৌরি নদীতে স্টীম বোট চালানো শুরু হয়ে গেল। একাই ক্যাপ্টেন সারেঙ ইঞ্জিন এমন কি নির্দেশক ঘণ্টাও। কখনো ক্যাপ্টেনের গলায় আদেশ হাঁকছে, সারেঙদের সাবধানী কথা নকল করছে, পরক্ষণেই গর্জে উঠছে ইঞ্জিনের শব্দ, তারপরেই শোনা যাচ্ছে নির্দেশক ঘণ্টার ডিং-ডং ডিং-ডং। স্টীম বোট চালাতে চালাতে টমের কাছে এসে গেল বেন।

'টিঙা-লিং টিঙা-লিং! জিঁঞাওঁওঁওঁ...ডিরডিঁরডিরডিডিডি... ফুট ফুট ফুট ফুট!' থেমে গেল স্টীম বোট।

চাইলোই না টম। আপনমনে ব্রাশ ঘষছে বেড়ায়।

'খুব কাজের চাপ, নারে?' জিজ্ঞেস করলো স্টীম বোট।

জবাব দিলো না টম। যেন শুনতেই পায়নি।

'এই টম, কাজ করছিস এখনো?'

ঝট্ করে ঘুরলো টম। 'আরে, বেন যে! খেয়ালই করিনি!'

'সাঁতার কাটতে যাচ্ছি। তুই যাবি না? আর যাবিই বা কি করে? যে কাজ!'

অবাক হয়েছে যেন টম। 'কাজ! কাজ কাকে বলছিস?'

'কেন? কাজ করছিস না তুই?'

'কি জানি বাপু!' মুখ বাঁকালো টম। 'তোর কাছে কাজ হতে পারে। আমার তো ভালোই লাগছে।'

'তুই, মানে টম সয়্যার...তোর কাছে ভালো লাগছে!'

সমানে ব্রাশ চালাচ্ছে টম। 'লাগছেই তো। আর লাগবে না কেন? বেড়ায় সাদা রঙ লাগানোর সুযোগ কটা ছেলে পায়?'

হঠাৎ নতুনভাবে ব্যাপারটাকে দেখলো বেন। আপেলে কামড় বসাতে গিয়েও থেমে গেল। টমের ব্রাশ চালানো দেখছে। একবার এদিক, একবার ওদিক, একবার ওপরে, একবার নিচে রঙ লাগাচ্ছে টম। দ্রুত বেড়ার চেহারা বদলে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও বিচিত্র চেহারার ছোটখাটো ফাঁক থেকে যাচ্ছে। ওসব জায়গায় ব্রাশ চেপে ধরছে টম, দেখতে দেখতে পাল্টে যাচ্ছে চেহারাগুলো, মিলিয়ে যাচ্ছে রঙের প্রলেপ পড়তেই। তাজ্জব তো! 'টম!' মিনতি করলো বেন। 'আমাকে একটু রঙ লাগাতে দিবি?'

বেনের কথাটা যেন বিবেচনা করছে টম, এমনি ভাবসাব। শেষে মাথা নাড়লো, 'নারে, বেন, দিতে পারবো না। এই বেড়াটাকে কি পরিমাণ ভালোবাসে খালা, জানিসই তো। ভেতরের দিকটা হলে কোন কথা ছিলো না, কিন্তু এটা বাইরের দিক। রাস্তা দিয়ে লোক যাবার সময় চেয়ে দেখে। রঙ একটু খারাপ হলেই খেপে যাবে খালা।'

'না, হবে না। দিয়েই দেখ না একবার। আমি হলে কিন্তু এভাবে নিরাশ করতাম না তোকে।'

'বেন, সত্যিই তোকে দিতে চাইছি আমি, কসম। কিন্তু পলি খালা...। জিম রঙ করতে চেয়েছিলো, তাকে দেয়নি খালা। সিড চেয়েছিলো। তাকেও না। আমাকে কতোখানি বিশ্বাস করেছে বুঝতেই পারছিস। এরপর যদি এদিক ওদিক হয়...'

'হবে না, টম। খুব মন দিয়ে রঙ লাগাবো। যদি দিস, এক কামড় আপেল দেবো তোকে।'

'না বেন। আমি...আমার ভয়...মানে তুই পারবি না...'

'যা, তোকে পুরো আপেলটাই দিয়ে দেবো।'

নিতান্ত অনিচ্ছায় যেন বেনের হাতে ব্রাশ তুলে দিলো টম। খুশিতে নাচছে মন। গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে আরাম করে বসলো গিয়ে।

বিশাল বেড়ায় রঙ লাগাতে লাগাতে দরদর করে ঘামছে মিসৌরি নদীর স্টীম বোট, আড়চোখে দেখছে টম। মনের আনন্দে আপেলে কামড় বসাচ্ছে, চিবুচ্ছে ধীরেসুস্থে।

রঙ লাগাতে লাগাতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে এলো বেন। সাধ মিটেছে। চলে

গেল সে।

এরপর বিলি ফিশারকে পাকড়াও করলো টম। একটা ঘুড়ির বিনিময়ে।

বিলি চলে গেলে এলো জনি মিলার। তাকে আটকালো টম। একটা মরা ইঁদুর আর ওটাকে ঝোলানোর একটা সুতো দিলো জনি। হাতে তুলে নিলো রঙের ব্রাশ। কাজে লেগে গেল।

এভাবে একজনের পর একজন এলো গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চললো কাজ। সকালের হতাশ টমের মন এখন খুশিতে ভরা। তার আশপাশটা ঐশ্বর্যে বোঝাই। বিচিত্র সেসব জিনিস। বারোটা মারবেল, ভাঙা বোতলের এক টুকরো নীল কাচ-ভেতর দিয়ে দেখা যায় আবার সেটার, একটা বাতিল চাবি, চকের টুকরো, মদের বোতলের একটা কাচের ছিপি, একটা টিনের সৈনিক, একটা এক চোখ কানা খেলনা বিড়াল, দরজার একটা পেতলের হাতল, কুকুরের গলার একটা বন্ধনী, ছুরির একটা ভাঙা বাঁট, চার টুকরো কমলার খোসা, জানালার ভাঙা একটা শার্সি, আরও এমনিসব টুকিটাকি জিনিস।

চমৎকার একটা দিন কাটলো টমের। যথেষ্ট সঙ্গ পেয়েছে, হরদম কথা বলতে পেরেছে, বেড়াটারও চার ভাগের তিন ভাগ রঙ করা সারা। ইস্, রঙ ফুরিয়ে গেল! নইলে বেড়াটা পুরো রঙ করা হয়ে যেতো, আর গাঁয়ের সবকটা ছেলেকেও ফতুর করে দিতে পারতো সে।

দুনিয়াটাকে সকালের মতো আর অর্থহীন মনে হলো না। মানব চরিত্রের দুটো বড় সত্যকে আবিষ্কার করে ফেলেছে সে আজ। এক: দুর্লভ জিনিসের প্রতি মানুষের অসাধারণ লোভ। যতো তুচ্ছই হোক, মানুষের প্রচণ্ড আগ্রহ মূল্যবান করে তোলে ওই জিনিসটাকে। দুই: কাজকে কাজ হিসেবে নিলেই কঠিন। খেলা হিসেবে নেয়া গেলে অনেক অনেক সহজ হয়ে যায়।

খালি বালতিটা তুলে নিয়ে বাড়িতে চললো টম। খালাকে জানাতে হবে, কাজ শেষ।

তিন

পলি খালার সামনে এসে দাঁড়ালো টম। বাড়ির পেছন দিকের একটা সুন্দর ঘরে রয়েছেন খালা। একাধারে বেড, ব্রেকফাস্ট, ডাইনিং এবং লাইব্রেরি রুম এই ঘরটা। খোলা জানালার ধারে বসে উল দিয়ে কি যেন বুনছেন খালা। বাইরে থেকে আসছে গ্রীষ্মের চমৎকার হাওয়া, বয়ে আনছে ফুলের সুবাস। চারদিকটা নীরব, শুধু বাগান থেকে ভেসে আসছে মৌমাছির গুঞ্জন। একাই রয়েছেন খালা, কোলের ওপর ঘুমিয়ে আছে বিড়ালটা। নিরাপত্তার জন্যে চশমাটা ঠেলে তুলে দিয়েছেন মাথার ওপর, ধূসর হয়ে আসা চুলের ওপর বসে আছে ওটা।

টমকে দেখে অবাকই হলেন খালা। তাঁর ধারণা ছিলো, অনেক আগেই কাজ ফেলে পালিয়েছে টম।

'খালা, খেলতে যাবো এবার?' জিজ্ঞেস করলো টম।
'এখুনি? কাজ কদ্দূর?'
'হয়ে গেছে।'
'দেখ টম, মিছে কথা একদম সইতে পারি না আমি।'
'মিছে নয়, খালা। কাজ শেষ করে এসেছি।'

টমের কথা বিশ্বাস হলো না পলি খালার। বিশ ভাগ কাজও যদি করে থাকে টম, তাহলেই খুশি তিনি। দেখার জন্যে বেরিয়ে এলেন। তাজ্জব হয়ে গেলেন। প্রায় পুরো বেড়াটাই রঙ করা হয়ে গেছে। 'টম, ইচ্ছে করলে কাজ করতে পারিস বটে তুই! কিন্তু করতেই তো চাস না। যা, খেলতে যা। তবে তাড়াতাড়ি ফিরবি। নইলে চাবকাবো ধরে। ও হ্যাঁ, শোন। আয় এদিকে।'

ঘরে নিয়ে গিয়ে সবচেয়ে ভালো আপেলটা টমকে দিয়ে দিলেন পলি খালা। এক মুহূর্ত সময় পেলো সে। ওই সুযোগেই চট্ করে একটা কেক সরিয়ে ফেললো। তারপর খুশিতে নাচতে নাচতে খেলতে চললো।

ঘর থেকে বেরিয়েই দোতলার সিঁড়ির কাছে সিডকে দেখতে পেলো টম। চোখের পলকে টব থেকে মাটির ঢেলা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো সিডের গায়ে। একের পর এক মারতেই লাগলো। সিডের আর্তচিৎকারে কেঁপে উঠলো পুরো বাড়ি। পড়িমরি করে ছুটে এলেন পলি খালা। কিন্তু ততোক্ষণে গোটা সাতেক ঢিল মারা হয়ে গেছে। টম হাওয়া।

গোয়ালঘরের ধার দিয়ে ছুটে আঙ্গিনার বাইরে বেরিয়ে এলো টম। থামলো না। আরও কয়েকটা বাড়ি পেরিয়ে রাস্তায় উঠে এলো। আপেল চিবুতে চিবুতে এগিয়ে চললো হেলেদুলে। যাক, আরেকটা কাজ সারা হয়েছে। কালো সুতোর কথা বলে দিয়েছিলো সিড, প্রতিশোধ নেয়া হয়ে গেছে।

এক জায়গায় এসে দেখলো যুদ্ধযুদ্ধ খেলছে একদল ছেলে। দুটো দলে ভাগ হয়েছে যোদ্ধারা। একদলের জেনারেল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জো হারপার। আরেক দলের জেনারেল সেজে বসলো টম। বাধলো তুমুল যুদ্ধ। ভয়ংকর যুদ্ধের পর জিতলো টমের দল। এরপর সমঝোতা হলো, চুক্তি হলো। লাশ গোনা হলো, বন্দি বিনিময়ও শেষ। আগামী যুদ্ধের দিন নির্দিষ্ট করে বাড়ি ফিরে চললো ছেলের দল। টমও রওনা হলো।

জেফ থ্যাচারের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় থমকে দাঁড়ালো সে। বাগানে ফুল গাছে পানি দিচ্ছে একটা অচেনা মেয়ে। খুব সুন্দরী। নীল চোখ, সোনালি চুলের বেণী ঝুলে পড়েছে দু'কাঁধে। সাদা সামার ফ্রক পরনে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাকে পছন্দ হয়ে গেল সদ্যজেতা যুদ্ধনায়কের। গত তিনমাস ধরে পটিয়েপাটিয়ে মাত্র এক হপ্তা আগে বন্ধুত্ব হয়েছে অ্যামি লরেন্সের সঙ্গে। কিন্তু নতুন এই মেয়েটাকে দেখামাত্রই অ্যামিকে মন থেকে দূর করে দিলো মহানায়ক, নির্দ্বিধায়।

মেয়েটার চোখে পড়ার জন্যে নানারকম অঙ্গভঙ্গি শুরু করে দিলো টম। কিন্তু ফিরেও তাকালো না মেয়েটা। পানি দেয়া শেষ করে, একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল গটগট করে। চুপসে গেল টম। তার এতো

কায়দাকৌশল কোনই কাজে লাগলো না।

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটা। আড়চোখে ঠিকই দেখেছে টমকে। রাস্তায় টমের দিকে ছুঁড়ে মারলো ফুলটা। তারপর ঢুকে পড়লো ঘরে।

ছুটে গেল টম। কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়ালো। কেউ দেখে ফেললো না তো আবার? সতর্ক চোখে তাকালো এদিক ওদিক। না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তবু সাবধানের মার নেই। রাস্তা থেকে একটা কঞ্চি কুড়িয়ে এনে নাকের ওপর খাড়া করার চেষ্টা চালালো। নাক থেকে পড়ে গেল কঞ্চিটা। ইচ্ছে করেই যেন ফুলটার পাশে পড়লো। কঞ্চি তুলে নেয়ার ছুতোয় চট্ করে ফুলটা তুলে নিলো টম। হাঁটতে শুরু করলো।

পথের বাঁক ঘুরেই থামলো টম। কঞ্চি ফেলে দিয়ে ফুলটা গুঁজলো জ্যাকেটের বাটনহোলে, হৃদয়ের কাছাকাছি (ধরে নিতে হবে)। কারণ বাটনহোলটা পেটের ওপর, বুকের কাছে নয়। তবে অতোসব নিয়ে মাথা ঘামালো না টম। আবার ফিরে এলো বাগানের ধারে।

বাগানের ধারে এসে আবার নানারকম কায়দা কসরৎ শুরু করলো টম। কিন্তু আর বেরোলো না মেয়েটা। কোন জানালা বা দরজায়ও দেখা গেল না। তবে টমের ধারণা, কোথাও লুকিয়ে থেকে তার কাণ্ডকারখানা নিশ্চয় দেখছে মেয়েটা। এটা ভেবেই খুশি হয়ে উঠলো সে। আঁধার নামা পর্যন্ত চালিয়েই গেল। তারপর খুশি মনে ফিরে চললো বাড়িতে।

খাবার টেবিলেও টমের খুশি দেখে অবাক হলেন পলি খালা। 'হলো কি ছেলেটার!' ভাবলেন তিনি। সিডকে ঢিল মারার জন্যে ঘরে ঢুকেই বেতের বাড়িও খেয়েছে টম, কিন্তু কিছুই মনে করেনি সে। কড়া নজর রাখলেন তিনি টমের ওপর। তাই চিনি চুরি করতে হাত বাড়িয়েই হাতে থাপ্পড় খেলো টম।

'খালা, তুমি খালি আমাকে মারো। সিডকে কিছু বলো না কেন?'

'সিড তো তোর মতো জ্বালায় না। খেতে বসেও শান্তি নেই, চিনি চুরি করার তালে আছিস।'

কি একটা কাজে রান্নাঘরে গেলেন পলি খালা। এটাই সুযোগ। চিনির পাত্রটা কাছে টেনে নিলো সিড। টমের দিকে চাইলো বাঁকা চোখে, পিত্তি জ্বলে গেল টমের। খালা এসে দেখলেও কিছু বলবে না সিডকে।

এই সময় ঘটলো অঘটন। কি করে জানি হাত পিছলে গেল সিডের। পাত্রটা হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল।

টমের খুশি দেখে কে? চুপ করে রইলো সে। খালা আসুক, তারপর বুঝবে মজা বাছাধন! চিনির পাত্র ভেঙেছো, ওঁহু। সিড হলেও আজ রেহাই পাবে না।

চোখের কোণ দিয়ে খালাকে ঘরে ঢুকতে দেখলো টম। তবু কিছুই বললো না। খালা কি বলে শোনার অপেক্ষায় আছে। তারপর গোমড় ফাঁক করবে।

কিন্তু সে সময় আর পেলো না বেচারা টম। দারুণ এক থাপ্পড় খেয়ে চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে গেল। আবার চড় মারার জন্যে উঠে গেছে খালার হাত। চেঁচিয়ে উঠলো টম, 'আমাকে মারছো কেন? ভেঙেছে তো সিড!'

থমকে গেলেন খালা। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে

নিলেন তিনি। মনে মনে অনুশোচনা হলো। অযথা মারলেন ছেলেটাকে। কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ করলেন না। তবে আরেকটু সদয় হলেন টমের ওপর। ভালো খাবারটা তুলে দিলেন টমের পাত্রে।

সবই বুঝলো টম। কিচ্ছু বললো না। মুখ গোমড়া করে রাখলো। খেয়েদেয়ে গিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। ভাবতে লাগলো: ইস্, এমন যদি হতো, এখন নদীতে ডুবে মরে যেতো সে! পলি খালার অবস্থা দেখতে পারতো তাহলে। তার সাদা ঠাণ্ডা লাশটাকে ধরে কেঁদেকেটে অস্থির হতো খালা। বিলাপ করে বলতো, 'ওরে টম! তুই আবার ফিরে আয় বাবা! ঈশ্বর, আমার টমকে বাঁচিয়ে দাও। আর ওকে কিচ্ছু বলবো না!' তারপর যদি তাকে আবার জ্যান্ত করে দিতো ঈশ্বর, কি মজাটাই না হতো! আর তাকে কিচ্ছু বলতো না খালা। যা খুশি করে বেড়াতে পারতো টম...এই সময় মেরিকে ঢুকতে দেখে ভাবনা থেমে গেল টমের। মেরি ওর খালাতো বোন এক হপ্তার জন্যে বেড়াতে গিয়েছিলো। আবার বাড়ি ফিরে এসেছে। খুব খুশি হলো টম। মেরি না থাকলে বাড়িটাই যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

চোখ বুজে আছে টম। মেরি মনে করলো ঘুমিয়ে আছে, আলো কমিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে আবার ভাবতে লাগলো টম। রাত সাড়ে ন'টা-দশটার দিকে উঠে পড়লো বিছানা ছেড়ে। পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো বাইরে। রাস্তায় পড়েই হাঁটতে লাগলো দ্রুত পায়ে।

থ্যাচারের বাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো টম। একটা জানালা খোলা। ম্লান আলো এসে পড়েছে বাইরে। নিঃশব্দে জানালার কাছে এগিয়ে গেল সে। উঁকি দিলো ভেতরে। কেউ নেই। আসবে, এঘরে আসবেই মেয়েটা! জানালার নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো টম।

হঠাৎ তার মাথায় এসে পড়লো এক গামলা পানি। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে ময়লা পানি ফেলেছে বাড়ির চাকরানীটা।

চমকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মহানায়ক। আর থাকা যায় না এখানে। বাড়ির দিকে ছুটলো সে। খিঁচড়ে গেছে মনমেজাজ।

ঘরে ঢুকে আলো বাড়ালো টম। নিজের ময়লা জামাকাপড়গুলো দেখলো একবার। দ্রুত হাতে খুলে ফেলতে লাগলো।

ঘুমায়নি সিড। আড়চোখে টমের অবস্থা দেখলো। এখুনি পলি খালাকে ডাকলে আরেক দফা ধোলাই চলবে টমের ওপর। কিন্তু চুপ করে থাকাই ভালো মনে করলো সিড। টমকে আবার শত্রু বানানো মোটেও উচিত কাজ হবে না।

চার

কার্ডিফ পাহাড়ের মাথায় সূর্য উঠলো। সোনালি আলোয় ভাসিয়ে দিলো ছোট্ট গ্রামটাকে।

নাস্তা শেষ। রোববারের নিয়মিত কাজে মন দিলেন পলি খালা। বাইবেল নিয়ে বসলেন।

শ্লোক মুখস্থ করতে বসলো টম। সিড আগের দিনই মুখস্থ করে রেখেছে, তাকে আর বসতে হলো না এখন। অন্তত পাঁচটা শ্লোক মুখস্থ করতে হবে টমকে। খুঁজেপেতে 'সারমন অন দ্য মাউন্ট' বের করলো সে। কারণ এই অধ্যায়ের শ্লোকগুলো ছোট ছোট।

আধঘণ্টা চেষ্টা করেও পারলো না টম। দুত্তোর বলে রেখে দিতে যাচ্ছিলো, এই সময় এলো মেরি। 'কিরে টম, পারছিস না বুঝি? আবার চেষ্টা করে দেখ। মুখস্থ করতে পারলে তোকে একটা জিনিস দেবো।'

'সত্যি বলছো মেরি'পা?'

'হ্যাঁ।'

আবার মুখস্থ করতে বসলো টম। ভালোমতো হলো না, তবে ভুলভাল করে কিছু কিছু পারে এখন না দেখে। এতেই হবে। একটা নতুন 'বারলো' ছুরি বের করে দিলো মেরি। সাড়ে বারো সেন্ট দাম। দারুণ জিনিস। খুব খুশি টম। কি কাটা যায়? এদিক ওদিক তাকালো সে। চোখে পড়লো আলমারিটা। ওটার ওপরেই পরীক্ষা চালাতে যাবে, এই সময় ডাকলো মেরি। রোববারের স্কুলের জন্যে তৈরি হতে হবে।

উঠে গেল টম। বারান্দায় একটা গামলায় করে পানি দিয়েছে মেরি। একটা সাবান রেখেছে পাশে। হাতমুখ ধুতে বলে চলে গেল সে।

সাবানটা তুলে নিলো টম। এদিক ওদিক চেয়ে চট্ করে একবার গামলায় চুবিয়েই রেখে দিলো। দুহাত ভিজিয়ে নিয়ে কাত করে ঢেলে ফেলে দিলো সবটুকু পানি। ভেজা হাত মুখে বুলিয়ে নিয়েই এসে ঢুকলো ঘরে। তোয়ালে টেনে হাতমুখ মুছতে গেল।

টান মেরে তোয়ালেটা কেড়ে নিলো মেরি। 'হ্যাঁরে টম, তুই এমন হলি কেন? হাতমুখ ধুতেও কষ্ট লাগে তোর?'

আবার পানি এনে দিলো মেরি। সামনে দাঁড়িয়ে রইলো। এবার আর সাবান ঘষে উপায় থাকলো না। ভালো করে হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গেলো টম। তোয়ালে দিয়ে মুছলো। ধোয়া পরিষ্কার জামাকাপড় এনে দিলো মেরি। নিতান্ত অনিচ্ছায়ও পরতে হলো টমকে। চুল আঁচড়ে দিলো মেরি। শোলার হ্যাট একটা টুপি পরিয়ে দিলো টমের মাথায়। যাক্, বাঁচা গেল। জুতোর কথা ভুলে গেছে মেরি। কিন্তু না, ভোলেনি। সদ্য কালি দেয়া জুতোজোড়া নিয়ে এলো সেটা। পরতেই হলো টমকে। অস্বস্তিতে হাঁসফাঁস করছে সে। কিন্তু চেয়েও লাভ হলো না মেরি। রোববারের স্কুলে না সেজেগুজে যাওয়া চলবে না। মুখ গোমড়া করে রইলো টম।

আগেই তৈরি হয়ে গেছে সিড। মেরিও তৈরি হলো। তিনজনেই বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে।

রোববারের স্কুল, এই আরেকটা জায়গাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে টম। কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই। পলি খালার বেত পড়বে পিঠে।

সাবাথ স্কুল চলবে ন'টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত। তারপরে গির্জার আসল কাজ, মানে প্রার্থনা শুরু হবে।

গির্জার দরজার কাছে এসেই ভাইবোনের কাছ থেকে পিছিয়ে পড়লো টম।

'বিলি, হলুদ টিকেট আছে?' জিজ্ঞেস করলো টম।

'আছে।'

'কি দিলে দিবি?'

'তুই কি দিতে পারবি?'

'একটা বড়শি।'

'দেখা।'

দেখালো টম। মাল বিনিময় হয়ে গেল। এরপর বিভিন্ন জিনিসের বিনিময়ে একটানা পনেরো মিনিট টিকেট কিনে গেল টম। হলুদ টিকেট, লাল টিকেট, নীল টিকেট। তারপর এসে ঢুকলো গির্জার ভেতরে। পিঠ খাড়া কাঠের গদিশূন্য চেয়ারগুলোতে বসে আছে ছেলেমেয়েরা। এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝগড়া শুরু করে দিলো কাছের ছেলেটার সঙ্গে। এগিয়ে এসে ঝগড়া থামালেন প্রৌঢ় শিক্ষক। কিন্তু তিনি পেছন ফিরেও সারতে পারলেন না, সামনের একটা ছেলের চুল ধরে টান মারলো টম। ছেলেটা ফিরে চেয়ে দেখলো বইয়ে মগ্ন টম সয়্যার। ছেলেটা মুখ ফেরাতে না ফেরাতেই আরেক ছেলের পাছায় পিন ফুটলো। উহ্ করে ফিরে চেয়ে টমের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিলো ছেলেটা। আবার এলেন শিক্ষক। এবার একটু কড়া গলায় শাসিয়ে গেলেন।

প্রথম সারি থেকে এক এক করে ছাত্র-ছাত্রীকে পড়া জিজ্ঞেস করছেন শিক্ষক। কিন্তু একটা ছেলেও সঠিক করে বলতে পারছে না শ্লোক। পুরস্কারের লোভ আছে, তবুও না। দুটো শ্লোক ভালো করে বলতে পারলে একটা নীল টিকেট দেয়া হবে। এমনি দশটা নীল টিকেটের সমান একটা লাল টিকেট। আবার দশটা লাল টিকেটের সমান একটা হলুদ টিকেট। সাবাথের দিন গির্জায় দশটা হলুদ টিকেট দেখাতে পারবে যে, তাকে সুদৃশ্য বাঁধাই একটা বাইবেল উপহার দেয়া হবে। চল্লিশ সেন্ট দাম ওই বাইবেলের।

বাইবেল উপহার পেতে হলে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়। দু'হাজার শ্লোক মুখস্থ করা সোজা কথা না। পর পর দু'বছর অসামান্য পরিশ্রম করে দুটো বাইবেল উপহার পেয়েছে মেরি। একটা জার্মান ছেলে পেয়েছে পাঁচটা। কিন্তু বোধহয় এতো কষ্ট করতে গিয়েই সর্বনাশ হয়ে গেছে ছেলেটার। ব্রেনে প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। কি যেন একটা হয়েছে। হাবা হয়ে গেছে প্রখর বুদ্ধিমান ছেলেটা।

বাইবেল পাবার দিকে মোটেই ঝোঁক নেই বেশির ভাগ ছেলেমেয়ের। টমের তো আরও নেই। তবে বাইবেল উপহারের অনুষ্ঠানটা খুব লোভনীয়। যে উপহার পায়, তার গর্বের সীমা থাকে না। গাঁয়ের সব লোকের চোখে সে একটা সাংঘাতিক কেউকেটা গোছের কিছু হয়ে যায় কয়েক সপ্তাহের জন্যে। এই কেউকেটা হবার লোভটা পুরোপুরিই আছে টমের।

পবিত্র পুস্তক হাতে মঞ্চে উঠে এলেন সুপারিনটেনডেন্ট। হালকা টিংটিঙে

শরীর, বাদামী চুল। বয়েস পঁয়তিরিশ। ইনি মিস্টার ওয়াল্টার।। মঞ্চে উঠেই সুরু করে শ্লোক পাঠ আরম্ভ করলেন। কেউ শুনছে না তারা স্তোত্রপাঠ।। শেষে ছোটখাটো এক বক্তৃতা দিতে হলো তাঁকে:

'ছেলেমেয়েরা, শোন। আমার কথা শোন।। চুপ করে শোন সবাই।। ওই যে একটা মেয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে।। ফেরো, এদিকে ফেরো মেয়ে।। কি করে ভালো সৎ মানুষ হওয়া যায় শোনাচ্ছি তোমাদের...'

বলে গেলেন মিস্টার ওয়াল্টার।। হাঁ করে তাঁর দিকে চেয়ে আছে ছেলেমেয়েরা। কিন্তু বেশির ভাগের কানেই তাঁর কথা ঢুকলো বলে মনে হলো না।।

বক্তৃতা থামলো। ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকলেন জেফ থ্যাচার, জজ।। মাঝবয়েসী লোকটার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলো তাঁর স্ত্রী।। আর পেছনে ও কে? সেই মেয়েটা না? অ্যামি লরেন্সের দিক থেকে দরজার দিকে চোখ ফিরিয়েছিলো টম, মেয়েটাকে দেখেই স্থির হয়ে গেল। পরক্ষণেই মেয়েটার চোখে পড়ার জন্যে বিভিন্ন কায়দা শুরু করে দিলো।

অনেক দেশ ঘুরে এ-গাঁয়ে আবার ফিরে এসেছে থ্যাচার। নামের আগে জজ পদবী রয়েছে। কাজেই যথেষ্ট সম্মানী লোক তিনি।। গির্জার সবচেয়ে সম্মানিত আসনটা দেয়া হলো তাঁকে। সুপারিনটেনডেন্ট থেকে শুরু করে ছোটখাটো শিক্ষকরা সবাই তাঁর নজরে পড়তে উদগ্রীব।

পুরস্কার বিতরণ শুরু হলো। লাল নীল তো আছেই, হলদে টিকেটও পেলো কয়েকজনে। কিন্তু বাইবেল উপহার পাবার জন্যে যথেষ্ট না।। এই সময় সিট থেকে উঠে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল টম।। তীব্র চোখে তার দিকে তাকালেন মিস্টার ওয়াল্টার। মেয়েটার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে সুপারিনটেনডেন্টের দিকে ফিরলো টম। 'আমাকে বাইবেল দিন।'

মিস্টার ওয়াল্টারের তো ভিড়মি খাবার জোগাড়। বলে কি ছেলেটা!! অজ্ঞান হয়ে চেয়ে আছেন টমের হাতের দিকে।। মেলে দেয়া হাতের তালুতে ন'টা হলুদ টিকেট, ন'টা লাল টিকেট আর দশটা নীল টিকেট। একটা শ্লোক ঠিকমতো বলতে পারবে কিনা টম, যথেষ্ট সন্দেহ আছে মিস্টার ওয়াল্টারের। নিশ্চয় কোন রহস্য আছে এর ভেতরে। কিন্তু সম্মানিত অতিথিদের সামনে এসব কেলেংকারি ফাঁস করা চলে না। বাধ্য হয়েই নিয়ম অনুযায়ী একটা বাইবেল তুলে দিতে হলো টমের হাতে।

গর্বিত চোখে ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে চাইলো টম। টমের আসল উদ্দেশ্য বুঝে এখন মনে মনে হা-হুতাশ করছে যারা টিকেট বেচেছিলো তার কাছে। গর্বে জ্বলজ্বল করে উঠলো অ্যামি লরেন্সের মুখ, কিন্তু পরক্ষণেই কালো হয়ে গেল আবার। না, টমের চোখ তো তার দিকে নেই!! টমের দৃষ্টি অনুসরণ করে চেয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল অ্যামি। জেলাস হয়ে উঠলো প্রথমে, রাগ হলো, শেষে পানি বেরিয়ে এলো চোখ থেকে। ঘেন্না ধরে গেল 'টম' জাতটার প্রতি।।

জজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো টমের।। খুশিতে উদ্বেলিত হচ্ছে টমের হৃদয়। আড়চোখে একবার তাকালো মেয়েটার দিকে।। জজের দিকে তাকালো আবার।

'নাম কি তোমার, খোকা?' জিজ্ঞেস করলেন জজ।

'টম।'

'টম তো নাম হলো না। ভালো নাম...'

'টমাস।'

'হ্যাঁ, এবার হয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে আরো কিছু আছে নিশ্চয়।'

'ভদ্রলোককে তোমার আরেকটা নাম বলো, টমাস,' বললেন মিস্টার ওয়াল্টার। 'আর বলার সময় "স্যার" বলবে। সৌজন্য ভুললে তো চলবে না।'

'টমাস সয়্যার...স্যার।'

'গুড বয়। খুব ভালো ছেলে। দু'হাজার শ্লোক মুখস্থ করেছো, সোজা কাজ না। এভাবে পরিশ্রম করতে এখন কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে খুব কাজে লাগবে। তখন এই পরিশ্রমের ফল পাবে। মনে করবে রোববারের স্কুলের কথা। যেখানে পরিশ্রম করতে শেখানো হয়েছে তোমাকে।' আরো সব উপদেশ দিয়ে গেলেন জজ। সব শুনলো কিনা, বুঝলো কিনা, টমের মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। হঠাৎ এক সময় বলে বসলেন জজ। 'এবার শোনা যাক, কি কি শিখেছো তুমি। যীশুখ্রীষ্টের বারোজন শিষ্যের নাম নিশ্চয় জানা আছে তোমার। প্রথম দুজনের নাম বলো তো?'

জামার একটা বাটনহোলে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে চুপ করে রইলো টম। একেবারে বোকা হয়ে গেছে। তার দুরবস্থায় মজা পেলো ছেলের দল, যারা টিকেট বেচেছিলো তার কাছে। লাল হয়ে উঠেছে টমের গাল, মাথা নিচু করে রেখেছে।

ভেতর ভেতর একেবারে দমে গেলেন মিস্টার ওয়াল্টার। কেন যে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে গেলেন জজ সাহেব! টমকে বাঁচিয়ে দেবার জন্যে বললেন, 'লজ্জা কিসের ছেলে? বলো, জবাব দাও। এই সহজ উত্তরটা তো জানাই আছে তোমার। বলে ফেলো।'

মাথা তুললো না টম। আরো লাল হয়ে উঠেছে গাল।

'আমাকে বলবে?' বললেন এক শিক্ষয়িত্রী। 'এতো লাজুক ছেলে! বলে ফেলো বাবা, বলো প্রথম দুজন শিষ্যের নাম।...'

শিক্ষয়িত্রীর দিকে চাইলো টম। হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠলো, 'ডেভিড এবং গোলাইয়াথ।'

পাঁচ

সাড়ে দশটা নাগাদ বাজতে শুরু করলো গির্জার ফাটা বেল। সকালের উপাসনার জন্যে হাজির হতে ডাকা হচ্ছে লোককে। রোববারের স্কুলের ছেলেমেয়েরা তাদের বাপমায়ের কাছে এসে বসলো। ইতিমধ্যেই এসে গেছেন পলি খালা। তাঁর পাশে এসে বসলো মেরি, সিড আর টম।

বার বার জানালার দিকে সতৃষ্ণ চোখে তাকাচ্ছে টম। আহা, যদি তাকে

ওটার কাছা-কাছি বসতে দেয়া হতো! বাইরে কি সুন্দর রোদ, গাছপালা, গ্রীষ্মের মনোরম দৃশ্য! কিন্তু সেদিকে তাকে যেতেই দিলেন না পলি খালা।

একে একে এসে হাজির হচ্ছে লোকেরা। এলেন বুড়ো দরিদ্র পোস্ট মাস্টার। তাঁর পেছন পেছনই এসে ঢুকলেন মেয়র দম্পতি। তারপর এলেন উইডো ডগলাস। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি এই বিধবা মহিলার। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্মার্ট। এ গাঁয়ে একমাত্র তাঁর বাড়িটাকেই প্রাসাদ বলা চলে। তারপর এলেন মেজর ওয়ার্ড আর তাঁর স্ত্রী। তাঁদের পেছনেই ঢুকলেন উকিল রিভারসন। সবার শেষে এলেন মিসেস মুফারসন, ছেলের হাত ধরে এসে হলে ঢুকলেন তিনি। এ গাঁয়ে তাঁর ছেলে উইলিকে আদর্শ ছেলে হিসেবে জানে সবাই।

স্তোত্রপাঠ শুরু করলেন পাদ্রী। সবাই চুপ করে শুনছে, কিংবা শোনার চেষ্টা করছে। সেদিকে মোটেই মন নেই টমের। খালি উসখুস করছে, এদিক চাইছে, ওদিক চাইছে। পলি খালা বসে আছেন পাশে, কোন ছেলেকে খোঁচাতেও পারছে না। মহা মুসিবতে পড়েছে সে।

এই সময়ই মাছিটা দেখতে পেলো টম। তার সামনের চেয়ারের পেছনে বসে আছে। সামনের দুই থাবা তুলে জোরে জোরে ঘষছে মাছিটা, পেছনের পা তুলে ডানা পরিষ্কার করছে। প্রার্থনা চলছে, এখন নড়াচড়া মানা। টমের ওপর জোর মানসিক অত্যাচার চালিয়ে গেল মাছিটা। বুঝতে পারছে যেন, এখন এখানে ভয়ের কিছু নেই। শেষ হয়ে আসছে প্রার্থনা। শেষ লাইনটা বলা শেষ করলেন পাদ্রী। সম্মিলিত গুঞ্জন উঠলো: 'আমেন।' ব্যস, বন্দি হয়ে গেল মাছি। কিন্তু পলি খালা দেখে ফেললেন ব্যাপারটা। মাছিটাকে আবার ছেড়ে দিতে হলো টমের।

বাইবেল থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন এক যাজক। একঘেয়ে ভারি কণ্ঠস্বর। মোটেই ভালো লাগছে না টমের। কখন যে শেষ হবে এসব! এক জায়গায় এসে পাঠের ব্যাখ্যা করলেন যাজক:...সিংহ আর ভেড়া পরস্পরের সঙ্গী হয়ে গেল। ওগুলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো সেই শিশু...। সেই শিশু হতে তার আপত্তি নেই, ভাবলো টম। অবশ্য যদি সিংহটা পোষা হয়, আর সত্যিই হিংস্রতা ভুলে গিয়ে থাকে।

একঘেয়ে বক্তৃতা চলছে তো চলছেই। আর পারছে না টম। এই সময়ই মনে পড়লো তার কথাটা। আরে, ওটা তো তার পকেটেই আছে! ছোট একটা বাক্সে ভরা আছে সাংঘাতিক এক গুবরে পোকা। ধারালো বিশাল দুটো দাড়া আছে ওটার।

আর অপেক্ষার কোন মানে হয় না। পকেট থেকে বাক্সটা বের করলো টম। বন্দিখানা থেকে বেরিয়েই পোকাটা নির্দ্বিধায় জেলারের আঙুলে দাড়া দিয়ে সাংঘাতিক চিমটি কেটে বসলো। উহ্, করে ঝাড়া মারলো টম। ছিটকে গিয়ে মাটিতে পড়লো পোকাটা। আহত আঙুলটা মুখে পুরে চুষতে লাগলো জেলার।

চিত হয়ে মেঝেতে পড়েছে পোকাটা। ডানা আর পায়ে নানা কসরৎ করে নিজেকে সোজা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। পড়ে রইলো শক্ত খোলার ওপর। হাতের কাছেই ওটা, নিচু হলেই তুলে নেয়া যায়। কিন্তু খালার ভয়ে পারছে না টম। আরেক মানসিক অশান্তি।

এই সময়ই কি করে জানি এসে ঢুকলো একটা কুকুর। নিশ্চয় এখানেই কোথাও রয়েছে তার মালিক, গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক এসে হাজির হয়েছে। গ্রীষ্মের অলসতায় পেয়েছে যেন কুকুরটাকে, ধীরেসুস্থে এগোচ্ছে। কাছ দিয়ে যাবার সময় ওটার পেটে কষে লাথি মারার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করলো টম।

আরেক কদম এগোতে গিয়েই পোকাটা চোখে পড়লো কুকুরটার। মুহূর্তে অলসতা চলে গেল। নাক নামিয়ে শুঁকলো পোকাটাকে, সতর্ক চোখে চেয়ে ওটার চারপাশে ঘুরলো কয়েক চক্কর। আবার শুঁকতে গেল। হঠাৎ সচল হয়ে উঠলো পোকাটা। ভোঁতা একটা ঝিঁ ঝিঁ শব্দ তুলে আবার সোজা হবার কসরৎ চালালো। আঁতকে সরে এলো কুকুরটা। আবার এগিয়ে গেল। থেমে গেছে পোকাটা। আস্তে একটা পা সামনে বাড়ালো কুকুর। নখ দিয়ে পোকাটাকে এক খোঁচা দিয়েই দ্রুত আবার সরিয়ে আনলো থাবা। আবার ঝিঁ ঝিঁ শুরু করেছে পোকাটা। আবার ওটা থামতেই থাবা বাড়ালো কুকুর। চললো এমনি করেই। বিরক্তি দূর হয়ে গেছে টমের চেহারা থেকে। উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে সে।

কয়েকবার পোকাটাকে খুঁচিয়ে যথেষ্ট হয়েছে ভাবলো বোধহয় কুকুরটা। আসলে দারুণ ঘুম পেয়েছে ওটার। একবার লম্বা হাই তুলে পোকাটার ওপরই ঘুরলো এক চক্কর। তারপর গোবরের ওপর পেট রেখে শুয়ে পড়লো।

মাত্র একমুহূর্ত। "কেঁ-উঁ-উঁ" আর্তনাদ করেই লাফিয়ে উঠলো কুকুরটা। উৎসুক চোখে এতোক্ষণ কুকুর আর গোবরের কাণ্ড দেখছিলো আশপাশের লোকেরা। যাজকের কথায় খোড়াই কান ওদের। কুকুরটা চেঁচিয়ে উঠতেই রুমালে মুখ চাপা দিলো ওরা।

দারুণ সুখী টম। এ-কান থেকে ও-কানের গোড়ায় গিয়ে ঠেকেছে তার হাসি।

আবার গোবরেটাকে নিয়ে পড়েছে কুকুর। অনেকক্ষণ ধরে পোকাটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লো সে। হাই তুলতে লাগলো। ভুলে গেল গোবরের কথা। একবারে শিক্ষা হয়নি, আবার ওটার ওপরেই গিয়ে বসে পড়লো কুকুরটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই "কেঁ-উঁ-উঁ-উঁ" করে তুমুল আর্তনাদ তুলে লাফ মারলো সারমেয় প্রবর। আর থামলো না। সারা হলে মহা আলোড়ন তুলে ছুটে বেড়ালো কয়েক মুহূর্ত। মনিবের ওপর চোখ পড়তেই গিয়ে লাফিয়ে কোলে চড়লো তার।

টমের তো কথাই নেই, অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও হেসে পেট ফাটাতে লাগলো। কিছুতেই তাদেরকে শান্ত করতে পারলেন না অভিভাবকেরা।

এতোবড় শাস্তি নিয়মের পর আর প্রভুর আলোচনা চলে না। বক্তৃতা আগেই থেমে গেছে যাজকের। সভা ভেঙে দিতে বাধ্য হলেন পাদ্রী।

পোকাটাকে আর তুলে নেয়ার সাহস হলো না টমের। কিন্তু দুঃখ নেই তার। চরম আনন্দ দিয়েছে তাকে গুবরেটা।

খুশিতে নাচতে নাচতে বাড়ি চললো টম। বুঝে গেছে, ইচ্ছে আর চেষ্টা থাকলে ভীষণ গম্ভীর পরিবেশেও আনন্দ জোগাড় করে নেয়া যায়।

ছয়

সোমবার সকাল, এক মহা বিরক্তিকর সকাল টমের জন্যে। আবার যেতে হবে স্কুলে। চলবে পুরো সপ্তাহ ধরে। সেই কবে আসবে আবার শনিবার, ছুটি পাওয়া যাবে! নাহ্, আর ভালো লাগে না। এই স্কুলে যাবার ব্যাপারটা যদি বন্ধ করা যেতো কোনমতে! অসুখও হয় না। অসুখের কথা মনে পড়তেই ফন্দিটা মাথায় ঢুকলো টমের। বুড়ো আঙুলে যেখানে চোট পেয়েছে, ওটা ব্যথার ভান করলেই হয়। আর এতেও কাজ না হলে ওপরের পাটির একটা দাঁত তো নড়ছেই। ওটা ব্যথা করছে বললে আর অবিশ্বাস করতে পারবে না খালা।

ব্যস, কাজে লেগে গেল টম। বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে গোঙাতে শুরু করলো বার কয়েক গুঙিয়েও পাশে ঘুমন্ত সিডের সাড়া পেলো না।

আরো জোরে গুঙিয়ে উঠলো টম। কিন্তু তবু ঘুম ভাঙলো না সিডের। শেষে ভাইয়ের গায়ে কনুইয়ের জোর গুঁতো মারলো টম। নড়চেড়ে উঁহ হুঁ করে উঠলো সিড। চোখ মেললো না। আবার জোরে জোরে গোঙাতে লাগলো টম। আস্তে করে চোখ মেললো সিড। বার কয়েক মিটমিট করে পুরো খুলে ফেললো চোখের পাতা।

'টম! এই টম! কি হয়েছে তোর?' জিজ্ঞেস করলো সিড।

জবাবে আরো জোরে গোঙাতে লাগলো টম।

উঠে বসলো সিড। 'টম! ট-ম! এমন করছিস কেন? কি হয়েছে?'

গোঙানোর ফাঁকে ফাঁকে বললো টম, 'ওহ্, সিড, ধরিস না আমাকে। বাবারে! উহ্!'

'কি হয়েছে বলবি তো? খালাকে ডেকে আনবো?'

'না-রে, না! কাউকে ডাকতে হবে না! আমি শেষ!'

'না, আমি ডেকেই আনছি! এমন করে গোঙাস না টম, ভাই, সইতে পারছি না! শুরু হলো কখন থেকে?' কি হয়েছে। না জেনেই প্রশ্ন করলো সিড।

'কয়েক ঘণ্টা! উফ্‌ফ্, আমাকে ধরিস না, সিড! আগেই মরে যাবো তাহলে!'

'আরো আগে আমাকে জাগালি না কেন, টম? আরে এই টম, এমন করিস না! আমার কান্না পাচ্ছে! কি হয়েছে তোর, বল না!'

'তোর সব অপরাধ মাফ করে দিলাম আমি, সিড! ওহ্ বাবারে! মাগো!...সিড, আমার বিরুদ্ধে যতো কথা লাগিয়েছিস খালাকে, সব ভুলে গেলাম। আমি যখন থাকবো না...'

'টম, তুই মারা যাচ্ছিস? না, টম, মরিস না! আমি...আমি অন্যায়...'

'আমি সবার অপরাধ মাফ করে দিয়ে যাচ্ছি। বলিস ওদেরকে। ওরে বাবারে, গেলাম রে! সিড, একটা কথা রাখবি? আমার কানা খেলনা বিড়াল আর ভাঙা শার্সিটা দিয়ে দিস ওই নতুন মেয়েটাকে। ওকে বলিস...'

কিন্তু ততোক্ষণে উঠে পড়েছে সিড। ছোঁ মেরে জামাটা তুলে নিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল। মুচকে হাসলো টম। গোঙানি আরো বাড়িয়ে দিলো। শুনে মনে হচ্ছে এখন, সত্যিই খুব যন্ত্রণা হচ্ছে তার আঙুলে।

সিঁড়ি দিয়ে উড়ে যাচ্ছে যেন সিড, শোনা যাচ্ছে তার চিৎকার: 'খালা! খালা! জলদি এসো! টম মারা যাচ্ছে!'

'মারা যাচ্ছে!'

'হ্যাঁ, খালা! জলদি এসো!'

'দূর, কি যা তা বকছিস!' উঠে আসছেন খালা। ছুটে এসে ঢুকলেন টমের ঘরে। মুখ ফ্যাকাসে। তাঁর পেছনেই ঢুকলো মেরি আর সিড।

'কি রে টম, কি হয়েছে?' খালার গলায় উৎকণ্ঠা।

'ওহ্ খালা, আমি...'

'কি বাবা, কি হয়েছে?'

'আমার বুড়ো আঙুলটা অবশ হয়ে গেছে! আমি আর বাঁচবো না!'

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন খালা। কেঁদে ফেলেছিলেন, হাসি ফুটলো ঠোঁটে। 'টম, কি ভয়টাই না পাইয়ে দিয়েছিলি! চেঁচানো বন্ধ করে নেমে আয় তো দেখি!'

নিমেষে বন্ধ হয়ে গেল গোঙানি। বোকা বোকা চোখে খালার দিকে চেয়ে ভুলটা কি করেছে বোঝার চেষ্টা করলো। 'খালা, আঙুল অবশ নাহয় নাই হলো। দাঁতটা কিন্তু সত্যিই ব্যথা করছে।'

'করছে নাকি? দেখি তো কি হয়েছে তোর দাঁতে?'

'ভীষণ নড়ছে দাঁতটা। ছুঁতেই পারছি না।'

'দেখি, আয় তো এদিকে। না না, আবার গোঙানি শুরু করিসনে। দেখি হাঁ কর। হুঁম্‌ম্, দাঁতটা সত্যিই নড়ছে। গাধা কোথাকার। দাঁত নড়লে মরে যায় নাকি মানুষ? এই মেরি, সিল্কের সুতো নিয়ে আয় তো খানিকটা। আর চিমটায় চেপে এক টুকরো কয়লা নিয়ে আসিস চুলা থেকে।'

'না না, খালা, দাঁতটা টেনে তুলো না! আর ব্যথা করছে না এখন। ব্যথা করলেও আর চেঁচাবো না! দোহাই তোমার, খালা! আর ফাঁকি দিতে চাইবো না!'

'ও এই ব্যাপার! স্কুল ফাঁকি দিতে এই ফন্দি এঁটেছিলি? টম, তোকে নিয়ে আমি কি করি বল তো? আমার বুড়ো হাড় না জ্বালালে কি তোর চলে না?'

সুতো আর কয়লা এসে গেল। সুতোর একপ্রান্ত টমের নড়বড়ে দাঁতে বাঁধলেন খালা। অন্য প্রান্ত টান টান করে বাঁধলেন খাটের মশারি স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে। মেরির হাত থেকে চিমটাটা নিয়ে হঠাৎ জ্বলন্ত কয়লাটা বাড়িয়ে দিলেন টমের দিকে, তার মুখে চেপে ধরবেন যেন। ঝটকা মেরে মাথা পিছনে সরিয়ে নিলো টম। মশারির স্ট্যাণ্ডে বাঁধা সুতোয় ঝুলতে লাগলো দাঁত।

নাস্তা শেষে স্কুলে যাবার পথে এই দাঁত ফেলার ব্যাপারটাই বিরাট সাফল্য বয়ে আনলো টমের জন্যে। পথে যে ছেলের সঙ্গেই দেখা হলো, ব্যাপারটা বললো টম। সবাই কৌতূহলী হলো। হাঁ করে দাঁতের পাটিতে ফাঁকটা দেখালো সে। ছেলেদের মাঝে জোর আলোচনা শুরু হয়ে গেল টমের দাঁত ফেলা নিয়ে। আঙুল

কেটে গিয়েছে একটা ছেলের, কিন্তু সেই ব্যাপারটাও এখন ম্লান হয়ে গেছে।

এতোবড় একটা অপারেশনের খবর শুনিয়ে ছেলের দলকে তাক লাগাতে লাগাতে এগিয়ে চললো টম। এই সময়ই হাকলবেরি ফিনের সঙ্গে দেখা হলো তার। গাঁয়ের লোকে দেখতে পারে না হাকলবেরিকে, বিশেষ করে মায়েরা। তাদের মতে খুবই খারাপ ছেলে হাক। অলস, লেখাপড়া করে না, অল্প বয়সেই মস্তান। অথচ এমনি একটা বাজে ছেলের ভক্ত তাদের ছেলেরা, এজন্যে মায়েরা আরো বেশি দেখতে পারে না হাকলবেরিকে।

কাপড়চোপড়েরও ঠিকঠিকানা নেই হাকলবেরির। বড়দের ফেলে দেয়া কাপড় কুড়িয়ে নিয়েই তার চলে। ছেঁড়া প্যান্ট, কোটের ঝুল নেমে এসেছে হাঁটু পর্যন্ত। দোমড়ানো মোচড়ানো টুপিটায় অসংখ্য ফুটো। পায়ে জুতো নেই। ধুলোকাদার পুরু আস্তরণ গোড়ালির ওপর অবধি।

পুরোপুরি স্বাধীন হাকলবেরি ফিন। নিজের ইচ্ছেমতো চলে। কেউ বাধা দেবার নেই, শাসন করার নেই। ভালো আবহাওয়ায় অন্যের বাড়ির বারান্দায় শুয়েই রাত কাটিয়ে দেয়, আবহাওয়া খারাপ হলে গিয়ে শুয়ে পড়ে শুয়োরের বাথানে। স্কুলে যেতে হয় না, গির্জায় যেতে হয় না। যখন খুশি নদীতে মাছ ধরতে যায়, যখন খুশি সাঁতার কাটে। কারো সঙ্গে মারপিটের ইচ্ছে হলেই লেগে যায়। কখনো সাবান দিয়ে গা ঘষতে হয় না, কাপড় পরিষ্কার রাখতে হয় না, মুখ খিস্তি করে ইচ্ছেমতো গালাগাল দিলেও শাসন করতে আসে না কেউ। ওর স্বাধীনতা দেখে রীতিমতো হিংসে হয় টমের।

এহেন রোমান্টিক নায়ককে আসতে দেখে দূর থেকেই ডেকে উঠলো টম, 'এইই, হাকল!'

'আরে, টম!' কাছে এসে দাঁড়ালো হাকলবেরি।

'তোর হাতে ওটা কি রে?'

'মরা বিড়াল,' পেছন থেকে হাতটা সামনে নিয়ে এলো হাক।

'দেখি তো? আরে, এ যে একেবারে শক্ত হয়ে গেছে! কোথায় পেলি?'

'একটা ছেলের কাছ থেকে কিনেছি।'

'কি দিয়ে?'

'একটা নীল টিকেট আর শুয়োরের একটা ব্লাডার দিয়ে। কসাইখানা থেকে এনেছিলাম ব্লাডারটা।'

'টিকেটটা কোথায় পেয়েছিলি?'

'হপ্তা দুয়েক আগে বেন রোজারের কাছ থেকে কিনেছিলাম।'

'মরা বিড়াল দিয়ে কি হবে রে, হাক?'

'জড়ুল সারাবো।'

'জড়ুল সারানোর আরো ভালো উপায় আছে।'

'কি উপায়?'

'মন্ত্রপড়া পানি।'

'ওই পানির কথা আমিও শুনেছি। কিন্তু ওতে সারে বলে মনে হয় না।'

'কেন, সারে না কেন? সারানোর চেষ্টা করে দেখেছিস কখনো?'

'না। বব ট্যানার নাকি দেখেছে।'

'তোকে কে বললো?'

'ট্যানার বলেছে জেফ থ্যাচারকে, থ্যাচার জনি বেকারকে, জনি বলেছে জিম হলিসকে, জিম বেন রোজারকে, বেন বলেছে এক নিগ্রোকে, নিগ্রো ব্যাটা বলেছে আমাকে।'

'কি জানি, সব ব্যাটাই হয়তো মিথ্যে বলেছে, নিগ্রোটা ছাড়া। ওকে চিনি না আমি। তবে কোন নিগ্রোকে আজ পর্যন্ত মিথ্যে বলতে শুনিনি। মরুকগে ব্যাটারা! হ্যাঁরে হাক, কি করে কাজটা করলো বব ট্যানার, শুনেছিস?'

'শুনেছি। একটা গাছের পচা গুঁড়িতে বৃষ্টির পানি জমেছিলো। ওই পানিতে হাত চুবিয়ে রেখে কাজটা করেছিলো সে।'

'দিনের বেলা?'

'নিশ্চয়ই।'

'গুঁড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলো?'

'হয়তো!'

'পড়েছিলো কিছু?'

'পড়তেও পারে। জানি না।'

'এজন্যেই ওর জড়ুল সারেনি। আসলে নিয়ম অন্যরকম। রাতের বেলা একা যেতে হবে বনে। ঠিক মাঝরাতে গুঁড়ির পানিতে চোবাতে হবে হাত। গুঁড়ির দিকে পেছন করে বলতে হবে:

'বার্লি দানা, বার্লি দানা, ইনজুনের খাবার ফুরোল,

'যাদু পানি, যাদু পানি, খেয়ে ফেলো সব জড়ুল,' 'তারপর চোখ বন্ধ করে সরে আসতে হবে এগারো কদম। গোড়ালির ওপর ঘুরতে হবে তিন কদম। এরপর কোনদিকে না তাকিয়ে বাড়ি চলে আসতে হবে। পথে কারো সঙ্গে কোন কথা বলা চলবে না। মন্ত্রের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে।'

'শুনতে ভালোই লাগছে। কিন্তু এই নিয়মে কাজ করেনি বব ট্যানার।'

'ঠিকই। তাহলে একটা জড়ুলও থাকতো না আর তার গায়ে। কিন্তু মরা বিড়াল দিয়ে কি করে জড়ুল সারাবিরে, হাক?'

'কাজটা কঠিন। দুষ্ট কোন লোক মারা যেতে হবে এজন্যে। রাতের বেলা মরা বিড়াল হাতে অপেক্ষা করতে হবে তার কবরের কাছে। মাঝরাতে আসবে দুষ্ট ভূতেরা। ওদের দেখা যায় না। তবে জোরালো বাতাস বইলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি শব্দ শোনা যাবে হয়তো। কবরের দুষ্ট লোকটার প্রেতাত্মাকে জাগাবে ভূতেরা। ওদের ফিসফিস কথাবার্তা শুনতে পাওয়া যাবে, কিন্তু বোঝা যাবে না কিছুই। নতুন সঙ্গীকে নিয়ে চলে যাবে ভূতেরা। সেদিকে ছুঁড়ে মারতে হবে মরা বিড়ালটা। বলতে হবে:

মরার পেছনে যাচ্ছে ভূত,
ভূতের পেছনে বিড়াল,
বিড়াল বিড়াল দোহাই তোর,
নিয়ে যা সব জড়ুল!'

'খুব ভালো উপায়। এতে জড়ুল সারবেই। হাক, আগে কখনো চেষ্টা করে দেখেছিস?'

'না। বুড়ি মাদার হপকিনস বলেছে আমাকে।'

'ঠিকই বলেছে হয়তো। লোকের বিশ্বাস ওই বুড়িটা ডাইনি।'

'আসলেই বুড়িটা ডাইনি। আমার বাপকে যাদু করতে চেয়েছিলো সে। বাবা নিজে বলেছে আমাকে। একদিন এসেছিলো বাবা। সে সময়ই ডাইনিটা তার দিকে ফিরে তুকতাক শুরু করে। একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারে বাবা। সঙ্গে সঙ্গে মাথা সরিয়ে না নিলে সেদিনই অক্কা পেতো বুড়িটা। ও-মা, তারপর রাতটাও পেরোতে পারলো না! শুঁড়িখানা থেকে মাতাল হয়ে ফিরে একটা চালার ওপর উঠে শুয়েছিলো বাবা। গড়িয়ে পড়ে হাত ভাঙলো।'

'কি সাংঘাতিক! কিন্তু তোর বাপ কি করে জানলো, ডাইনিটা তাকে তুকতাক করছিলো?'

'বাবা বলে, এটা বোঝা সহজ। যখুনি কোন ডাইনি সরাসরি তোর দিকে চেয়ে থাকবে, বুঝবি, সে তোকে তুক করছে। আর তখন যদি সে বিড়বিড় করতে থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। তার মানে তখন মন্ত্র পড়ছে ডাইনিটা। আর মন্ত্রটা কি জানিস? প্রার্থনার শ্লোকের অক্ষরগুলো উল্টোদিক থেকে সাজিয়ে পড়তে হবে।'

'বুঝলাম। তা হোক, বিড়াল নিয়ে কাজ শুরু করতে যাচ্ছিস কবে?'

'আজ রাতেই। বুড়ো হস উইলিয়ামসকে নিতে আসবে ভূতেরা।'

'কিন্তু ওকে তো কবর দেয়া হয়েছে গত শনিবারে। সে-রাতেই তো তাকে তুলে নিয়ে যাবার কথা।'

'দূর, কিচ্ছু জানিস না! মাঝরাতের আগে আসে না ভূতেরা। আর শনিবারের মাঝরাত মানে কি? রোববার পড়ে গেল না? রোববারে আসে ভূতেরা? সাহস পায়? রোববার গিয়ে সোমবারে পড়লেও বেরোতে সাহস পায় না ওরা। বেরোয় গিয়ে তার পরের রাতে।'

'ওভাবে ভেবে দেখিনি। যা-ই হোক। আমাকে সঙ্গে নিবি?'

'নেবো। ভয় পাবি না তো?'

'না না। বিড়ালের ডাক ডাকিস?'

'ডাকবো। সারা দিবি কিন্তু। আগেও একদিন ডেকে ডেকে সারা হয়েছি, সারা দিসনি। শেষে 'হতচ্ছাড়া বিড়ালকে' গাল দিয়ে পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগলো হারামি হেজ। তবে আমিও ছাড়িনি। জানালা দিয়ে একটা ইঁট ছুঁড়ে মেরেছিলাম বুড়োকে। তারপর ভেগেছি।'

'তোর ডাক শুনেছি আমিও। কিন্তু সাড়া দিতে পারিনি। কি করবো, আমার ঘরে বসে ছিলো খালা। এবার ঠিকই সাড়া দেবো, দেখিস। আরে, ওটা কিরে?'

'এঁটুলি পোকা।'

'কোথায় পেলি?'

'বনে।'

'কি দিলে দিবি?'

'দিতে চাই না।'

'তত ভালো এঁটুলি না অবশ্য ওটা।'

'পরের জিনিসকেই সবাই খারাপ বলতে পারে। আমার কাছে এটা খুবই ভালো।'

'ওসব পোকা খুঁজলেই পাওয়া যায়। ইচ্ছে করলে হাজারখানেক জোগাড় করতে পারি আমি।'

'তাহলে তাই নিচ্ছিস না কেন? আসলে ঠিকই জানিস, পারবি না। এ-বছর এই প্রথম দেখলাম এঁটুলি, এই একটাকেই।'

'হাক...আমার দাঁত দিয়ে দিতে রাজি আছি। দিবি?'

'দাঁত! দেখি তো?'

পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বের করলো টম। মোড়ক খুলতেই বেরোলো দাঁতটা।

দেখলো হাক। চকচক করে উঠলো চোখ। 'আসল দাঁত তো?'

ঠোঁট উল্টে মাড়ি দেখালো টম।

'ঠিক আছে,' বললো হাক। 'আমি রাজি।'

টমের দাঁত চলে গেল হাকের পকেটে। এঁটুলিটা বন্দি হলো টমের ছোট বাক্সে, যেটা এর আগে গুবরের জেলখানা ছিলো। খুশি মনে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলো দুই বালক। নিজেকে আগের চেয়ে বিত্তবান মনে করছে এখন দুজনেই।

স্কুলে এসে পৌঁছুলো টম। এমনভাবে ক্লাসে ঢুকলো, যেন খুব তাড়াহুড়ো করে এসেছে। ইচ্ছে ছিলো না, তবু দেরি হয়ে গেছে। একটা হুকে টুপিটা ঝুলিয়ে রেখে নিজের সিটের দিকে চললো। তার ব্যস্ততায় হেসে উঠলো কয়েকটা ছেলে।

চেয়ারে বসে ঢুলছিলেন মাস্টার সাহেব। ছেলেরা হেসে উঠতেই তন্দ্রা টুটে গেল। টমকে দেখেই সোজা হলেন। 'টমাস সয়্যার!'

থমকে গেল টম। মাস্টার সাহেব তার পুরো নাম ধরে ডেকেছেন, তার মানেই বিপদ।

'জ্বী, স্যার!'

'এদিকে আসুন! তা স্যারের এতো দেরি কেন? একদিনও কি ঠিক সময়ে আসতে পারেন না?'

সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যে কথাটা বলতে গিয়েও থমকে গেল টম। চোখ পড়েছে একজোড়া সোনালি বেণীর ওপর। ধড়াস করে উঠলো হৃৎপিণ্ড। চোখ গেল মেয়েটার পাশের খালি সিটের ওপর। ওটা ছাড়া মেয়েদের অংশে আর কোন সিট খালি নেই। মনস্থির করে নিলো দ্রুত। 'হাকলবেরি ফিনের সঙ্গে কথা বলতে থেমেছিলাম, স্যার।'

স্থির হয়ে গেলেন মাস্টার সাহেব। অসহায়ভাবে চেয়ে রইলেন টমের দিকে। স্তব্ধ হয়ে গেছে ঘরের গুঞ্জন। ছোঁড়াটা বলে কি! মাথা ঠিক আছে তো!

'কার সঙ্গে!' অবশেষে বললেন মাস্টার সাহেব।

'হাকলবেরি ফিন, স্যার,' আরো পরিষ্কার করে বললো টম।

'টমাস সয়্যার, তোর সাহস হলো কি করে? আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথাটা বলতে সাহস করলি? খোল, জ্যাকেট খোল!'

সপাসপ বেতের বাড়ি পড়তে লাগলো টমের পিঠে। পরপর কয়েকটা বেত ভেঙে থামলেন মাস্টার সাহেব। 'যা, এবার মেয়েদের পাশে বোসগে! এটা তোর শাস্তি!'

এই শাস্তি পাবার জন্যেই ইচ্ছে করে সত্যি কথা বলেছে টম। খুশি মনে গিয়ে সোনালি বেণী মেয়েটার পাশে বসে পড়লো সে। টমের প্রতি অনেক বিদ্রূপের বাণ ছুটে এলো ছেলেমহল থেকে, কিন্তু কানেই তুললো না সে। সামনের টেবিলে বই ছড়িয়ে বসে গভীর মনোযোগে পড়ার ভান করতে লাগলো।

আস্তে আস্তে কমে এলো টমের প্রতি ছেলেদের মনোযোগ। থেমে গেল বিদ্রূপ, গুঞ্জন। আবার যার যার পড়ায় মন দিলো ছাত্র-ছাত্রীরা। এইবার সোনালি বেণীর দিকে খেয়াল দিলো টম। চোরা চোখে বার বার চাইতে লাগলো মেয়েটার দিকে।

চোখাচোখি হলো একবার, মুখ ভেঙচালো মেয়েটা। চোখ সরিয়ে নিলো। মিনিটখানেক পরে আবার ফিরে চেয়ে দেখলো, তার কাছে বেঞ্চিতে একটা আপেল পড়ে আছে। আপেল ঠেলে সরিয়ে দিলো মেয়েটা। খানিক পরে আবার চেয়ে দেখলো, আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে আপেল। আবার ঠেলে সরিয়ে দিলো মেয়েটা। আবার আগের জায়গায় ফিরে এলো আপেল। এমনি করে চললো বার কয়েক। তারপর আর সরানো হলো না আপেল, টম যেখানে রাখলো, সেখানেই রইলো।

শ্লেটে লিখলো টম: 'আপেলটা নাও। আমার আরো আছে।' কায়দা করে লেখাটা দেখালো মেয়েটাকে।

লেখা দেখলো মেয়েটা, পড়লো, কিন্তু নিলো না আপেলটা।

অন্য কায়দা বের করলো টম। কি যেন আঁকতে লাগলো শ্লেটে। বাঁ হাত দিয়ে আড়াল করে রেখেছে। দেখতে দিচ্ছে না মেয়েটাকে।

বার কয়েক চেষ্টা করেও দেখতে পারলো না মেয়েটা। কৌতূহল বাড়লো। শেষে ফিসফিস করে বলেই ফেললো, 'দেখাও না আমাকে!'

একটা বাড়ি এঁকেছে টম, চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে। খুব পছন্দ হলো মেয়েটার। কোথায় রয়েছে, ভুলেই গেল যেন। 'দারুণ হয়েছে! একটা মানুষ আঁকো না!'

বাড়ির সামনে একটা মানুষ দাঁড় করিয়ে দিলো টম। ওটা মানুষ, না কি, কিছুই বোঝার উপায় নেই। কিন্তু অতো সব খুঁত ধরলো না মেয়েটা। বরং বিদঘুটে চেহারাটার দিকে চেয়ে খুশিই হলো। 'বাহ্, সুন্দর মানুষ তো! এবার আমাকে আঁকো। বাড়ির দিকে যাচ্ছি।'

উল্টে রাখা একটা গেলাসমতো আঁকলো টম। তার ওপর বসিয়ে দিলো একটা পূর্ণ চাঁদ। গেলাসের ওপরের দিকে দু'পাশে দুটো রেখা টেনে হাত আঁকলো, তলায় আরো দুটো রেখা টেনে দিতেই হয়ে গেল পা। চারটে রেখার মাথায় দুটো ছোট পাখামতো এঁকে দিতেই হাত-পায়ের আঙুল হয়ে গেল। এরপর

চোখমুখ নাক কান বসিয়ে দেয়া একেবারে সোজা।

'কি সুন্দর হয়েছে!' বললো মেয়েটা। 'ইস্, আমি যদি আঁকতে পারতাম!'

'সহজ,' ফিসফিস করে বললো টম। 'শিখিয়ে দেবো তোমাকে।'

'সত্যি? দেবে? কখন?'

'দুপুরে। খেতে বাড়ি যাবে?'

'তুমি মানা করলে যাবো না।'

'ঠিক আছে। তা তোমার নামটাই তো জানি না।'

'বেকি থ্যাচার। তোমার? ও, জানি। টমাস সয়্যার।'

'পেটানোর আগে ওই নামে ডাকে আমাকে গুরুজনেরা। ওদের কাছে যখন আমি ভালো, তখন টম। তুমি আমাকে টম বলেই ডেকো।'

'ঠিক আছে।'

আবার শ্লেটে কি যেন লিখতে লাগলো টম। আড়াল করে রাখলো, দেখতে দিলো না বেকিকে।

অনুরোধ করলো বেকি, 'আমাকে দেখাও না, টম!'

'আরে না, দেখার মতো কিছু না।'

'নিশ্চয় দেখার মতো।'

'আরে নাহ্! তুমি দেখতেই চাইবে না।'

'চাইবো। সত্যিই চাইবো। প্লীজ, দেখাও!'

'তুমি বলে দেবে।'

'না না বলবো না। কসম খোদার, বলবো না।'

'কাউকে বলবে না? যতোদিন বেঁচে থাকো, কাউকেই বলবে না তো?'

'না, বলবো না। এবার দেখাও।'

'নাহ্, বলে দেবে।'

'তুমি এমন করছো, টম! আমি দেখবোই।' হঠাৎ হাত বাড়িয়ে শ্লেটের ধার চেপে ধরলো বেকি। টানতে লাগলো নিজের দিকে। বাধা দিচ্ছে টম, কিন্তু জোর নেই। আস্তে আস্তে মেয়েটার দিকে ফিরলো শ্লেট। লেখাটা দেখা গেল। পড়লো মেয়েটা: 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'যাহ্!' এক ধাক্কায় শ্লেটটা সরিয়ে দিলো বেকি। গাল লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু চেহারায় খুশি খুশি একটা ভাব।

ঠিক এই সময় কানে কঠিন চাপ অনুভব করলো টম। টানের সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে সে আস্তে আস্তে। আরেক কানে চাপ অনুভব করলো টম। কান চেপে ধরে শূন্যে তুলে ফেললো তাকে শক্তিশালী দুটো হাত। হাসির রোল উঠলো সারা ক্লাসে।

কান ধরে টমকে ছেলেদের এলাকায় টেনে নিয়ে গেলেন মাস্টার সাহেব। ধাক্কা দিয়ে একটা সিটে বসিয়ে ফিরে গেলেন নিজের জায়গায়।

ধীরে ধীরে আবার কমে এলো গুঞ্জন। নীরবে বইয়ের দিকে চেয়ে বসে রইলো টম। তার কান জ্বলছে, কিন্তু হৃদয় আনন্দে ভরপুর।

ছাত্রদেরকে পড়া জিজ্ঞেস করতে লাগলেন মাস্টার সাহেব। টমের পালা

এলো। সব কটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল সে নির্দ্বিধায়। কিন্তু সব উল্টোপাল্টা। হ্রদের নাম জিজ্ঞেস করা হলে বললো পর্বতের নাম, পর্বতের জায়গায় নদীর নাম, নদীর জায়গায় মহাদেশ। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো ছেলেমেয়েরা। শেষমেশ মাস্টার সাহেবের মুখও আর গম্ভীর রইলো না।

সাত

জোর করে বইয়ে মন বসানোর চেষ্টা চালালো টম। পারলো না। শেষে চেষ্টা বাদ দিয়ে লম্বা এক হাই তুললো। মনে হচ্ছে তার, দুপুরের টিফিনের ঘণ্টা কখনোই বাজবে না। বাতাস স্তব্ধ। চারদিক নীরব নিঝুম। গ্রীষ্মের দিনগুলোতে এমনিতেই ঘুম বেশি পায়, আজকের দিনটায় যেন ঘুম আরো বেশি আসছে। দূরে সবুজে ঢাকা কার্ডিফ পাহাড়ের গায়ে উজ্জ্বল রোদ, গাছপালার মাথার ওপরে শূন্যে কেমন এক ধরনের উজ্জ্বল ঝিলিমিলি–সাংঘাতিক গরমের জন্যেই ঘটছে এটা। পরিষ্কার ঝকঝকে নীল আকাশের অনেক ওপরে অলস ভঙ্গিতে ডানা মেলে দিয়ে ভেসে আছে চিল। একটু দূরে কয়েকটা গরু গাছের ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছে, এছাড়া আর কোন জীবন্ত প্রাণী চোখে পড়ছে না। উদাস হয়ে গেছে টমের মন। এই বন্দিদশা থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে কোথাও হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

সময় কাটানোর কোন কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না টম। এই সময়ই পোকাটার কথা মনে পড়লো তার। সঙ্গে সঙ্গে হাত চলে গেল পকেটে। বের করে আনলো ছোট বাক্সটা। এঁটুলিটাকে বের করে লম্বা চ্যাপ্টা ডেস্কের ওপর ছেড়ে দিলো।

অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলোয় এসে খুশি হয়ে উঠলো যেন পোকাটা। বন্দিদশা থেকে স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একদিকে হাঁটা শুরু করলো ওটা। একটা পিন এঁটুলির মাথার কাছে ধরে ওটার গতিপথ বদলে দিলো টম।

টমের পাশে বসেছে তার প্রিয় বন্ধু জো হারপার। টমের মতোই তার মনও উদাস হয়ে গিয়েছিলো, সময় কাটানোর কিছু খুঁজে পাচ্ছিলো না। পোকাটা দেখে সে-ও খুশি হয়ে উঠেছে। আরেকটা পিন নিয়ে টমের সাহায্যে এগিয়ে এলো সে। পোকাটাকে নিয়ে মগ্ন হয়ে গেল দুজনেই।

বেশিক্ষণ লাগলো না, একে অন্যের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠলো ওরা। দুজনের কেউই পুরোপুরি আনন্দ উপভোগ করতে পারছে না পোকাটাকে নিয়ে।

উপায় বের করলো টম। জো-র শ্লেটটা নিয়ে ডেস্কের ওপর চিত করে ফেললো। শ্লেটের মাঝ বরাবর চক দিয়ে একটা রেখা টানলো। পোকাটাকে রাখলো শ্লেটে।

'এখন,' বললো টম, 'যতক্ষণ তোর পাশে থাকছে পোকাটা, যতো খুশি খোঁচা, কিচ্ছু বলবো না। কিন্তু লাইন ক্রস করে এপারে চলে এলেই ও আমার। আমি খোঁচাবো। তুই হাত লাগাতে পারবি না।'

খুব চমৎকার প্রস্তাব। জো-র খুশি না হবার কোন কারণ নেই।

প্রথমে পোকাটার দখল নিলো টম। বার বার শ্লেটের বিষুবরেখা পেরোনোর চেষ্টা করছে পোকাটা। কিন্তু কিছুতেই যেতে দিচ্ছে না টম। দেখতে দেখতে শেষে বিরক্ত হয়ে উঠলো জো। শর্তের কথা ভুলে গিয়ে বেআইনিভাবে ঢুকে পড়লো অন্যের এলাকায়। ওর হাত সরিয়ে দিতে গেল টম। এই সুযোগে বিষুবরেখা পেরিয়ে এলো এঁটুলি। এবার ওটাকে নিয়ে পড়লো জো। আর কিছুতেই যেতে দিচ্ছে না টমের এলাকায়। শিগগিরই বিরক্ত হয়ে উঠলো টম। হাত বাড়ালো অন্যের এলাকায়।

'টম, হাত সরা,' শান্ত গলায় বললো জো।

'একটা, শুধু একটা খোঁচা দেবো জো।'

'না। ও আমার এলাকায় আছে।'

'দেখ জো, ওকে বেশি ঘাঁটাতে দেবো না আমি।'

'হাত সরা, টম!'

'সরাবো না।'

'সরা বলছি!'

'দেখ জো, বেশি গরম দেখাবি না। পোকাটা কার?'

'যারই হোক, ও এখন আমার এলাকায় আছে। তুই ছুঁতে পারবি না ওটাকে

'নিশ্চয় পারবো! আমার সম্পত্তি নিয়ে আমি যা খুশি করবো, তুই বলার কে?'

জবাবে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো জো, তার আগেই পড়লো সপাং করে বেতের বাড়ি। টমের পিঠে। পরক্ষণেই আরেক বাড়ি পড়লো জো-র পিঠে। এরপর পালা করে ধুলো উড়তে থাকলো দুজনের জ্যাকেটের পিঠ থেকে।

ওরা যখন পোকা নিয়ে গভীর মগ্ন, দুজনেরই অলক্ষ্যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন মাস্টার সাহেব। চুপচাপ থেকে নিজেও খানিকক্ষণ দেখেছেন খেলা, হয়তো উপভোগও করেছেন। তারপর বাধলো সম্পত্তি নিয়ে গোল। পরিস্থিতি চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে যাবার আগেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

জোর আর টমের দুর্দশায় হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলো পুরো ক্লাস। ঠিক এই সময়ই বাজলো টিফিনের ঘণ্টা।

একটা করে 'উপসংহার' বাড়ি দিয়ে ইস্তফা দিলেন মাস্টার সাহেব। বেরিয়ে গেলেন ক্লাস থেকে।

মনিবের মার খাবার সুযোগে কেটে পড়েছে পোকাটা। আর কোথাও দেখা গেল না ওটাকে। বাইরে বেরিয়ে এলো টম। বেকি থ্যাচারকে পাকড়াও করলো।

অন্য ছাত্রছাত্রীদের চোখের আড়ালে একটা ফুল গাছের ঝাড়ের ওপাশে বেঞ্চিতে এসে বসলো দুজনে। পাশাপাশি। বেকিকে ছবি আঁকা শেখাতে লাগলো টম।

বেকির হাতের ওপর টমের হাত। শ্লেটের ওপর ঘুরছে বেকির হাতের পেন্সিল।

'ইঁদুর ভালোবাসো তুমি?' জিজ্ঞেস করলো টম।

'না। ঘেন্না লাগে!'

'আমারও...জ্যান্ত ইঁদুরকে। তবে আমি মরা ইঁদুরের কথা বলছি। তার সঙ্গে

লেজে বাঁধা একটা সুতো যদি থাকে, মাথার ওপরে তুলে ঘোরানোর জন্যে, তাহলে তো কথাই নেই।'

'জ্যান্ত-মরা সব ইঁদুরই ঘৃণা করি আমি। তবে হ্যাঁ, চিউইংগাম আমার খুবই ভালো লাগে।'

'আমারও। এখন তো আমার কাছে নেই। থাকলে দিতাম।'

'আমার কাছে আছে। এক টুকরো। তোমাকে দিতে পারি, তবে খানিকক্ষণ চুষে আবার ফিরে দিতে হবে আমাকে।'

পালা করে চিউইংগাম চুষলো ওরা খানিকক্ষণ।

'সার্কাসে গেছো কখনো?' জানতে চাইলো টম।

'গেছি। আবার নিয়ে যাবে বাবা, বলেছে।'

'তিন-চার বার গেছি সার্কাসে। খুব ভালো লাগে। বড় হয়ে সার্কাসের ক্লাউন হবো।'

'সত্যি! হবে? উফ্, কি মজা! ক্লাউন আমারো খুব পছন্দ!'

'তোমার পছন্দ হলে তো কথাই নেই। আর টাকাও নাকি ভালো কামায় ওরা। বেন রোজারস বলেছে, দিনে এক ডলার। আচ্ছা বেকি, কারো সঙ্গে এনগেজমেন্ট করেছো কখনো?'

'কিসের?'

'বিয়ের?'

'নাহ্।'

'ইচ্ছে করে?'

'কি জানি! কেমন লাগে এনগেজমেন্ট করতে? কি কি করতে হয়?'

'বড়োরা তো হরদম করে দেখেছি। হয়তো ভালোই লাগে। না, করতে তেমন বিশেষ কিছুই লাগে না। শুধু কোন ছেলে বলবে তোমাকে: তোমাকে ছাড়া আর কাউকে কখনো চাই না আমি, কখনো না, কখনো না, কখনো না। তারপর তোমাকে চুমু খাবে ছেলেটা। ব্যস, হয়ে গেল এনগেজমেন্ট। যে কেউই করতে পারে এটা।'

'চুমু? চুমু খেতে হয় কেন?'

'হয়তো, হয়তো...কি জানি, বড়রা তো দেখি খায়!'

'সবাই?'

'সবাইই তো। যারা একে অন্যকে ভালোবাসে। মনে পড়ছে তোমার, শ্লেটে কি লিখেছিলাম?'

'অ্যা...হ্যাঁ!'

'যাও, বলতে পারবো না!'

'আমি বলে দিই?'

'ব...না না, অন্য সময় বলো।'

'না, এখন।'

'এখন না। আচ্ছা, আগামীকাল বলো।'

'না, বেকি, এখন বলবো। বেশি সময় লাগবে না। ফুস করে তোমার কানের

কাছে বলে দিতে পারবো। কেউ শুনবে না।'

দ্বিধা করতে লাগলো বেকি। মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে একহাতে বেকির গলা পেঁচিয়ে ধরলো টম, বড়দের করতে দেখেছে। বান্ধবীর কানের কাছে মুখ নিয়ে মিষ্টি করে উচ্চারণ করলো বাক্যটা। ফিসফিস করে বললো, 'এবার তুমি বলো আমার কানে কানে।'

আবার দ্বিধা করতে লাগলো বেকি। শেষে বললো, 'তুমি অন্যদিকে মুখ ফেরাও। তাহলে বলবো। কিন্তু খবরদার, কাউকে বলতে পারবে না! বলবে না তো?'

'পাগল,' অন্যদিকে মুখ ফেরালো টম। 'এবার বলো।

টমের কানের কাছে মুখ এনে বললো বেকি, 'আমি...তোমাকে...ভালোবাসি।' তারপর এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো টমের হাত থেকে। ছুটলো। স্কুল ঘরের এক কোণে গিয়ে বসে পড়লো। আর ছুটতে পারছে না। ছুটে আসছে টম। ফ্রকের ঝুল দিয়ে মুখ ঢাকলো বেকি।

বেকির ঘাড়ের কাছে মুখ এনে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো টম, 'প্লীজ বেকি, প্লীজ। সব কাজই তো হয়ে গেল। এবার শুধু চুমু খেতে দাও আমাকে, শুধু একবার। তাহলেই আমাদের এনগেজমেন্ট হয়ে যাবে। প্লীজ, বেকি!' একটানে বেকির হাতসুদ্ধ ফ্রকের ঢাকনা সরিয়ে দিলো টম।

বাধা দিলো বেকি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না টমকে। নিচু হয়ে টুক করে চুমু খেলো টম। 'ব্যস, বেকি। হয়ে গেল। আজ থেকে আমরা একে অন্যের। আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না আমরা।'

'না টম, জীবনে আর কাউকে ভালোবাসবো না আমি। আর কাউকে বিয়ে করবো না। শুধু তোমাকে।'

'এক্কেবারে ঠিকঠাকমতো কাজ করেছি আমরা। বড়রা যা করে থাকে। একটু ভুল করিনি। এখন থেকে একসঙ্গে স্কুলে আসবো আমরা, বেড়াতে যাবো, পার্টিতে যাবো, বড়রাও তাই করে।'

'খুব মজা হবে, না টম!'

'হ্যাঁ। খুব মজা। আমি আর অ্যামি লরেন্স একসাথে...' থেমে গেল টম।

ঝট্ করে চোখ তুলেছে বেকি। তার বড় বড় দুই চোখে ঝড়ের সংকেত দেখতে পেলো টম। বুঝলো, সাংঘাতিক ভুল করে ফেলেছে অ্যামির নাম নিয়ে।

'টম! আমার সঙ্গেই প্রথম এনগেজ করোনি তাহলে?'

কাঁদতে শুরু করলো বেকি।

'আহ্হা, বেকি, কেঁদো না! অ্যামির সঙ্গে আর আমার কোনো সম্পর্ক নেই এখন!'

'নিশ্চয় আছে! আছে!'

বেকির গলা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলো টম, কিন্তু ঝটকা মেরে সরিয়ে দিলো বেকি। ফিরে বসে কাঁদতে লাগলো। আবার বেকিকে শান্ত করার চেষ্টা করলো টম, কিন্তু কোন লাভ হলো না। আরো বারকয়েক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো সে। শেষে খেপে গেল, অহমে আঘাত লাগলো তার।

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো টম। ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলো। মাঝে মাঝে থেমে দাঁড়ায়–আশা, পেছন থেকে ডাকবে তাকে বেকি। কিন্তু বেকি ডাকলো না। দেয়ালের দিকে ফিরে ফুঁপিয়েই চলেছে। আবার ফিরলো টম। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালো বেকির পেছনে। 'বেকি...বেকি, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসি না আমি।'

জবাবে ফোঁপানি আরো বাড়লো বেকির।

'বেকি...প্লীজ, বেকি, কিছু একটা বলো!'

ফোঁপানো চলছেই।

পকেট থেকে সবচেয়ে প্রিয় রত্নটা বের করলো টম, দরজার একটা পেতলের হাতল। বেকির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'এটা নাও, বেকি। তোমাকে দিয়ে দিলাম।'

এক থাবায় টমের হাত থেকে হাতলটা ফেলে দিলো বেকি।

আর দাঁড়ালো না টম। গট গট করে হেঁটে বেরিয়ে এলো স্কুলের সীমানার বাইরে। ছুটলো পাহাড়ের দিকে। সেদিন আর ফিরে এলো না স্কুলে।

হঠাৎ বুঝতে পারলো বেকি, বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ফিরে চাইলো সে। নেই টম। চোখ মুছে এসে দাঁড়ালো মাঠের ধারে। কোথাও দেখা গেল না টমকে। ছুটে এসে দাঁড়ালো গেটের বাইরে। চেঁচিয়ে ডাকলো নিরুদ্দিষ্ট টমের উদ্দেশ্যে, 'টম! ট-ম! ফিরে এসো টম!'

সাড়া এলো না টমের কাছ থেকে।

হঠাৎই নিজেকে বড় বেশি নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগলো বেকির। ওখানে, ঘাসের ওপরই বসে পড়লো সে। কাঁদতে লাগলো আবার।

আবার ক্লাসের ঘণ্টা পড়লো। ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না বেকির, তবু যেতেই হলো।

সারাটা বিকেল আর সেদিন পড়ায় মন বসাতে পারলো না বেকি। ঘুরেফিরেই কেবলই মনে পড়ছে টমের কথা। হৃদয়ে অনুভব করলো এক অদ্ভুত শূন্যতা। মনে হলো তার, বড়ই নিরানন্দ এই পৃথিবী।

আট

সারাটা দিন বনেবাদাড়ে ঘুরে কাটালো টম। বাড়ি ফিরলো সাঁঝের বেলা। খাওয়াদাওয়া রোজকার মতোই রাত সাড়ে ন'টায় শুতে গেল সে আর সিড।

শিগগিরই ঘুমিয়ে পড়লো সিড। টম জেগে রইলো। সময় যেন কাটতেই চায় না। শুয়ে শুয়ে কেবলই উসখুস করছে সে, গড়াগড়ি করছে বিছানায়। যখন মনে হলো তার, ভোর হতে বেশি দেরি নেই, তখন বাজলো মাত্র দশটার ঘণ্টা। মাত্র সাড়ে ন'ঘণ্টা কাটলো! অন্ধকারে কান পেতে আছে টম। নিস্তব্ধতার মাঝে বড় বেশি জোরে বাজছে দেয়াল ঘড়ির টিক টিক। নিচের শোবার ঘর হতে ভেসে আসছে

পলি খালার নাক ডাকানোর শব্দ। হঠাৎ তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠছে ঝিঁঝি পোকা খানিকক্ষণ ডেকে ডেকে আবার থেমে যাচ্ছে হঠাৎ করেই। দূর থেকে ভেসে এলো কুকুরের চিৎকার, আরো দূর থেকে সাড়া দিলো আরেকটা কুকুর। আর চোখ মেলে রাখতে পারছে না টম।

তন্দ্রার ঘোরেই ঘড়ির এগারোটা ঘণ্টাধ্বনি শুনলো টম। খানিক পরেই ভেসে এলো বিড়ালের বিষণ্ন গলার ডাক। 'দূর দূর! ভাগ এখান থেকে, শয়তান!' চেঁচিয়ে উঠলো পাশের বাড়ির বুড়ো। বাড়ির পেছনে বোতল ভাঙার শব্দ উঠলো। বিড়ালটাকে ছুঁড়ে মেরেছে পড়শী।

নিমেষে তন্দ্রা টুটে গেল টমের। কাপড় পরে তৈরি হয়ে গেল মিনিটখানেকের ভেতরেই। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আস্তে করে বার দুই ডাকলো বিড়ালের ডাক। বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। বাড়ির পেছনের আঙিনায় চলে এলো। অপেক্ষা করছে হাকলবেরি ফিন। হাতে মরা বিড়াল।

আধ ঘণ্টা পর, কবরখানার লম্বা লম্বা ঘাস মাড়িয়ে এগোচ্ছে ওরা। গ্রাম থেকে মাইল দেড়েক দূরে পাহাড়ের মাথায় এই কবরখানা, পুরোনো ধাঁচের কাঠের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছিলো একসময়, এখন তার বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। এখনো দাঁড়িয়ে আছে যেসব তক্তা, হেলে আছে সামনে কিংবা পেছনে-দাঁড়িয়ে থাকার অবলম্বন খুঁজে খুঁজে ব্যর্থ যেন। লম্বা ঘাস আর আগাছার জঙ্গল ঢেকে ফেলেছে কবরখানা। ধসে গেছে পুরোনো কবরগুলো, সেখানে বিরাট বিরাট গর্ত, সংস্কার করা হয়নি আর। একটা কবরেও টম্বস্টোন নেই। তক্তায় নামধাম আর জন্মমৃত্যুর তারিখ লিখে কোন কোন কবরের মাথার কাছে মাটিতে পুঁতে দেয়া হয়েছে। বেশির ভাগ লেখাই ধুয়েমুছে গেছে রোদ-পানিতে একপাশে হেলে আছে ওসব তক্তা। আবার সোজা করে না দিলে পড়ে যাবে শিগগিরই।

গাছের পাতায় ঝাপটা দিয়ে গুঙিয়ে গেল এক ঝলক বাতাস। ধরেই নিলো টম, ওই গোঙানি মৃতের আত্মার, শান্তি বিঘ্নিত হওয়ায় প্রতিবাদ জানাচ্ছে। কথা বলতেই ভয় পাচ্ছে।

নিঃশব্দে এগিয়ে গেল দুজনে। শিগগিরই খুঁজে পেলো নতুন কবরটা। কয়েক ফুট দূরে প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে জন্মে আছে তিনটে দেবদারু। একটা গাছের গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লো দুজনে।

এইবার অপেক্ষার পালা। স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন এখানে সময়, নড়তেই চাইছে না। চারদিক নীরব নিঝুম। হঠাৎ কর্কশ গলায় ডেকে উঠলো এক প্যাঁচা, ওটার শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে যেন কেউ। চমকে উঠলো টম। ফিসফিস করে হাকের কানে কানে বললো, 'হাক, মরা লোকগুলো খেপে যাচ্ছে না তো আমাদের ওপর!'

'কি জানি!' ফিসফিস করেই জবাব দিলো হাক। 'জানতে পারলে ভালো হতো!'

'নিশ্চয় খেপেছে ওরা!'

আবার নীরবতা। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে দুজনেই।

'হাক,' আবার কথা বললো টম। 'হস উইলিয়ামস শুনতে পাচ্ছে আমাদের

কথা?'

'সে না শুনলেও নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছে তার প্রেতাত্মা।'

আরো খানিক নীরবতার পর বললো টম, 'মিস্টার উইলিয়ামস বলা উচিত ছিলো আমার। আসলে...আসলে সবাই হস বলে ডাকতো তো...।'

'বলে ফেলেছিস ফেলেছিস, এখন আর ভেবে কিছু হবে না।'

আবার থেমে গেল কথাবার্তা। আশঙ্কায় কাঁপছে টমের মন। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সঙ্গীর বাহু খামচে ধরলো সে। 'শুনতে পাচ্ছিস!'

'কি, টম?' সঙ্গীর গা ঘেঁষে এলো হাক।

'ওই যে আবার! শুনতে পাচ্ছিস না?'

'কই আমি...।'

'ওই...ওই যে আবার! এবার তো শুনেছিস?'

'ল-র্ড! টম, ওরা আসছে! আসছে! বল তো কি করি এখন!'

'জানি না! ওরা কি দেখতে পাবে আমাদের?'

'অন্ধকারেও ঠিক দেখতে পায় ওরা, বিড়াল যেমন দেখে! কেন যে এলাম মরতে!'

'ভয় পাসনে। আমাদের কিছু করবে না ওরা। আমরা তো ওদের কোন ক্ষতি করিনি। চুপচাপ থাক। হয়তো আমাদের দেখতেই পাবে না ওরা।'

'চেষ্টা তো করছি, টম। পারছি না। শরীর কাঁপছে থরথর করে!'

'শোন!'

কান পাতলো দুজনেই। শ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছে। কবরখানার শেষ প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে চাপা কথাবার্তা।

'আরে! দেখছিস!' ফিসফিস করে বললো টম। 'আলো!'

'ভূতের আলো! হা ঈশ্বর, কেন যে এলাম!'

আবছা অন্ধকারে এগিয়ে আসছে কয়েকটা মূর্তি। পুরোনো একটা হারিকেন আছে। কাঁপা কাঁপা ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়ছে খুব সামান্য জায়গা জুড়ে, তাতে কাটছে না অন্ধকার।

'ভূত, ভূত ছাড়া আর কিছু না!' হাকের গলা কাঁপছে। 'তিনটা! গেছি আজ! টম, প্রার্থনা করতে পারবি?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি। এতো ভয় পাসনে। ওরা আমাদের ক্ষতি করবে না। আমি...'

'শ-শ্-শ্!'

'কি হলো?'

'ওরা মানুষ! একজন...গলা চিনতে পারছি! মাফ পটার!'

'কি বলছিস!'

'ঠিকই বলছি। এক্কেবারে নড়বি না। আমাদের দেখতে পাবে না ব্যাটা। পাঁড় মাতাল। মদ খেয়ে ভোম্ হয়ে থাকে সারাক্ষণ।'

চুপ করে রইলো দুজনে। এগিয়ে আসছে মূর্তিগুলো। হঠাৎ টম বললো, 'থাকো থাক, আমিও একটা গলা চিনতে পারছি। ইনজুন জো!'

'হ্যাঁ, জো হারামিটাই! শয়তানের দোসর! কিন্তু ব্যাটারা এখানে কি করতে এসেছে?'

'আবার চুপ হয়ে গেল দুজনে। একেবারে কাছিয়ে এসেছে মূর্তিগুলো। গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো টম আর হাক। ওদের কয়েক ফুটের ভেতর এসে গেল তিন মূর্তি।

'ব্যস, এটাই,' বললো একজন। হাতের লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরলো। তরুণ ডাক্তার রবিনসন।

তার পেছনে পেছনে একটা ঠেলাগাড়ি ঠেলে নিয়ে আসছে মাফ পটার আর ইনজুন জো। হস উইলিয়ামসের কবরের ধারে এসে ঠেলা থামালো ওরা। কি দড়ি আর দুটো খন্তা নামালো। কবর খুঁড়তে শুরু করলো দুজনে।

কবরের মাথার কাছে হারিকেনটা রাখলো ডাক্তার। একটা দেবদারুর গোড়া এসে বসে পড়লো। চাইলে হাত বাড়িয়েই ওকে ছুঁতে পারে টম কিংবা হাক।

'জলদি করো!' চাপা গলায় বলে উঠলো ডাক্তার। 'যে কোন সময় বেরিয়ে আসতে পারে চাঁদ।'

চুপচাপ কাজ করে চললো দুজনে। মাটিতে খন্তা দিয়ে খোঁচানো আর আলগা মাটি ছুঁড়ে ফেলার একঘেয়ে শব্দ উঠছে। হঠাৎ কাঠের ডালায় খন্তার পাড় লেগে ভোঁতা আওয়াজ হলো। মিনিটখানেক পরেই কফিনটা তুলে নিয়ে এলো দুজনে। ঠিক এই সময় মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো চাঁদ। তিনটে চেহারা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠলো এখন। তাড়াতাড়ি কফিন থেকে লাশটা বের করে ঠেলায় ফেললো ওরা। চাদর দিয়ে ঢেকে ঠেলার সঙ্গে বেঁধে ফেললো দড়ি। একটা ছুরি বের করে দড়ির বাড়তি মাথাটা কাটতে কাটতে বললো পটার, 'ব্যস, কাম শেষ করে দিলাম। ডাক্তার, আরো গোটা পাঁচেক ডলার ছাড়ো।'

'ঠিক,' সায় দিয়ে বললো জো।

'আবার টাকা চাইছো কেন?' বললো ডাক্তার। 'যা চেয়েছিলে, আগাম মিটিয়ে দিয়েছি।'

'তা দিয়েছো,' এগিয়ে এলো জো। 'কিন্তু ডাক্তার, তুমি একটা জিনিস পাওনা আছো আমার কাছে। পাঁচ বছর আগে এক রাতে তোমাদের বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। খিদেয় পেট জ্বলছিলো। কিছু খাবার চেয়েছিলাম। দিলে তো না-ই, উল্টে ধরে চোর বলে মারতে শুরু করলো তোমার বাবা। আমাকে জেলে পাঠালো। মনে করেছো ভুলে গেছি? রেড ইণ্ডিয়ানরা ভোলে না। এখন তোমাকে কায়দায় পেয়েছি, পাওনা মিটিয়ে দেবো ভালোমতো।' ঘুসি পাকিয়ে ডাক্তারের সামনে এগিয়ে এলো সে।

কিন্তু তার আগেই মেরে বসলো ডাক্তার। মুখে ঘুসি খেয়ে পড়ে গেল জো।

বন্ধুকে মার খেতে দেখে ছুরি ফেলে দিয়ে ছুটে এলো পটার। জাপটে ধরলো ডাক্তারকে। ঘাসের ওপর পড়ে গেল দুজনেই। গড়াগড়ি করতে লাগলো, একবার এ নিচে পড়ে, একবার ও। দলেমুচড়ে যেতে লাগলো ঘাস।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো জো। নিচু হয়ে পটারের ছুরিটা তুলে নিয়ে এগিয়ে এলো, সামান্য একটু কুঁজো হয়ে আছে শরীর। সামনে বাড়ানো ছুরি ধরা হাত

ডাক্তারের গায়ে বসিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজছে।

হঠাৎ এক ঝটকায় পটারের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো ডাক্তার। কফিনের ডালার একটা ভারি তক্তা তুলে নিয়েই মেরে বসলো পটারের মাথায়। ঠিক এই সময় তার পিঠে ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিলো জো। হুঁশ হারিয়ে চিত হয়ে পড়ে গেছে পটার। আর্তনাদ করে উঠে তার বুকের ওপরই আছড়ে পড়লো ডাক্তার। টান মেরে আবার ছুরিটা খুলে নিলো জো। ফোয়ারার মতো ছিটকে বেরোলো রক্ত ডাক্তারের পিঠের ক্ষত থেকে।

ঠিক এই সময় আবার মেঘে ঢাকা পড়ে গেল চাঁদ। প্রায় ছিটকে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো দুই বালক। অন্ধকারে পড়িমরি করে ছুট লাগালো গাঁয়ের দিকে।

আবার মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো চাঁদ। নিথর পড়ে থাকা দেহ দুটোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইনজুন জো। 'যাক, এতোদিনে শোধ নিলাম!'

ডাক্তারের পকেট হাতড়ে টাকা পয়সা আর মূল্যবান জিনিস যা আছে বের করে নিজের পকেটে ঢোকালো জো। রক্তাক্ত ছুরিটা পটারের বিছিয়ে থাকা হাতের তালুতে রেখে দিলো। উঠে এসে বসলো কফিনটার ওপর।

সময় যাচ্ছে। তিন মিনিট গেল...চার...পাঁচ মিনিট পেরোলো। নড়েচড়ে উঠলো পটার। গুঙিয়ে উঠলো। ছুরিটার ওপর শক্ত হলো হাতের আঙুল, তুলে নিয়ে এলো চোখের সামনে, দেখলো, তারপরই ছেড়ে দিলো হাত থেকে। কেঁপে উঠলো একবার। ঠেলে বুকের ওপর থেকে সরিয়ে দিলো ডাক্তারের দেহ। উঠে বসলো। অবাক চোখে দেখলো একবার রক্তাক্ত লাশটা, চোখ তুলে চাইলো জো-র দিকে।

'জো, এটা কি হলো?'

'খুবই খারাপ হয়েছে,' শান্ত গলায় বললো জো। 'কিন্তু খুন করতে গেলি কেন?'

'আমি! কক্ষনো না!'

'তাহলে কে করলো কাজটা?'

আবার কেঁপে উঠলো পটার। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে।

'ইস্, কেন যে এতো মদ গিললাম! মাথার ভেতরে এখনো কেমন জট পাকিয়ে আছে! ...জো, সত্যি করে বল, আমিই করেছি কাজটা! ...জো, আমি করতে চাইনি, কসম খোদার, করতে চাইনি! কি করে করলাম জো, সব খুলে বল আমাকে!'

'জড়াজড়ি গড়াগড়ি করছিলি তোরা। হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় ডাক্তার। তক্তা তুলে বসিয়ে দেয় তোর মাথায়। পড়ে গেলি। পরক্ষণেই টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালি আবার। আবার তোর মাথায় বাড়ি মারতে গেল ডাক্তার। তুইও ছুরি বসালি, সে-ও বাড়ি মারলো। তুই পড়ে গেলি। সে পড়লো তোর ওপর।'

'ইস, কি যে করে বসলাম! সব হুইস্কির দোষ, জো। সব শালা মদের দোষ! জো, তোর দোহাই লাগে, কাউকে বলে দিস না! বলবি না তো জো? তোর

জন্যেই মারতে গেলাম ওকে। বলিস না জো। তোর গোলাম বনে থাকবো। বলিস না জো,' বলতে বলতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো পটার। আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে দু'হাত জড়ো করে নিয়ে এসেছে বুকের ওপর।

'না, পটার, বলবো না। তুই আমার জন্যে অনেক করেছিস। কাউকে বলবো না আমি।'

'ওহ্, জো, তুই একটা দেবতা। তোর এই দয়ার কথা কোনদিন ভুলবো না আমি।' কাঁদতে শুরু করলো পটার।

'হয়েছে হয়েছে, চুপ কর। তোর ওসব ছেলেমি থামা এখন। ওঠ, কেটে পড়তে হবে। তুই ওদিক দিয়ে যা, আমি এদিকে যাচ্ছি। দেখিস, যাবার পথে কোনরকম চিহ্ন ফেলে যাসনে।'

লাফিয়ে উঠেই জো-র নির্দেশিত পথে চলতে শুরু করলো পটার। গতি দ্রুত হতে হতে দৌড়ে রূপ নিলো। সেদিকে তাকিয়ে থেকে আপনমনেই বিড়বিড় করলো জো, 'ছুরিটার জন্যে আবার না ফিরে আসে ব্যাটা! না, মনে হয় না। যা ভয় পেয়েছে, আসবে না।'

আরো মিনিট দুই-তিন ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো খুনেটা। তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো।

কবরের গর্তের ধারে পড়ে আছে খোলা কফিন, চাদরে ঢাকা লাশ, মাটিতে ডাক্তারের রক্তাক্ত মৃতদেহ। আকাশে আধক্ষয়া লালচে হলুদ চাঁদ। ঘোলাটে আলো ছড়াচ্ছে।

দেবদারুর মাথায় বসে হঠাৎ কর্কশ গলায় ডেকে উঠলো একটা প্যাঁচা।

পড়িমরি করে ছুটছে ছেলেদুটো। মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে আতঙ্কিত চোখে পেছনে তাকাচ্ছে, খুনেটা ছুটে আসছে কিনা দেখছে। গাঁয়ের সীমানায় ঢুকে পড়েছে ওরা। একটা বাড়ির পাশ দিয়ে আসার সময় তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো একটা কুকুর। তাড়া করে এলো খানিকটা। কিন্তু পায়ে পাখা লাগিয়েছে যেন টম আর হাক। কুকুরটাও পেরে উঠলো না ওদের সঙ্গে।

'কোনমতে ট্যানারিটার কাছে পৌঁছুতে পারলেই হতো!' জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে টম। 'কিন্তু আর জোর নেই পায়ে!'

জবাব দিলো না হাক। তার অবস্থাও টমের মতো। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস পড়ছে।

থামলো না ওরা। আধমন ভারি ঠেকছে একেকটা পা। কিন্তু তবু কোনমতে চালিয়ে নিয়ে চললো ও দু'টোকে।

ট্যানারিটার কাছে এসে পৌঁছতে পারলো ওরা। পুরোনো বাড়িটার সামনে আঙিনায় ধপাস করে বসে পড়লো দুজনেই। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলো হৃৎপিণ্ডের গতি।

'গাঁয়ে খুব হৈ-চৈ পড়ে যাবে রে, হাক!' ফিসফিস করে বললো টম।

'খালি হৈ-চৈ! ফাঁসি হয়ে যাবে!'

'তাই মনে হয় তোর?'

'মনে হয় কি রে? তাই তো হবে।'

কি যেন ভাবলো টম। বললো, 'কে জানাচ্ছে খবরটা? আমরা?'

'নিশ্চয়ই না। হঠাৎ কিছু একটা ঘটে গেল, ফাঁসি হলো না জো হারামজাদার, কি অবস্থা হবে আমাদের? নির্ঘাত আমাদেরকেও খুন করবে ব্যাটা!'

'ঠিক বলেছিস। আমিও তাই ভাবছিলাম।'

'মাফ পটারই বলুকগে। মাতাল তো, বোকামি করেই বসতে পারে।'

চুপ করে আবার কি ভাবতে লাগলো টম। তারপর বললো, 'মাফ পটার তো জোকে ছুরি বসাতে দেখেনি। কি করে জানছে সে ডাক্তারকে কে খুন করেছে?'

'কেন, জানছে না কেন?'

'ও তো মাথায় বাড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো। জো ছুরি বসিয়েছে দেখবে কি করে?'

'হুঁ!'

'তাছাড়া ওই বাড়িতে পটারও খতম হয়ে গেছে কিনা কে জানে!'

'না, তা মরবে না। মাতালগুলো মাথায় বাড়ি খেলেও ঠিক বেঁচে যায় জানি! আমার বাপকে তো দেখলাম চিরকাল। সারাক্ষণই মাতাল হয়ে থাকে। যখন বেশি মাতাল হয়ে যায়, যতো খুশি পেটাও ধরে, খেয়ালই করবে না। পটার আর আমার বাপ এক জাতের। তবে কে জানে...।' চুপ করে গেল হাক।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর টম কথা বললো, 'হাক, মুখ বন্ধ করে রাখতে পারবি তো?'

'পারতেই হবে, টম। নইলে জো-র হাত থেকে রেহাই পাবো না। যদি কোনমতে ফাঁসি দেয়া থেকে বেঁচে যায় হারামিটা, আমাদের শেষ করে ফেলবে। ...টম, কসম খা, কাউকে বলে দিবি না।'

'বলবো না। কসম খেলাম। তুইও কসম খা।'

দুজনে প্রতিজ্ঞা করলো একে অন্যের কাছে, ডাক্তার রবিনসনের খুনের ব্যাপারে কাউকে কিচ্ছু বলবে না।

উঠলো ওরা। টম বাড়ি ফিরে যাবে। হাক যাবে শুয়োরের খোঁয়াড়ে।

পথে দুজনকে তাড়া করলো একদল কুকুর। বাড়ি আর ফেরা হলো না। একদিকে ফিরে ছুট লাগালো ওরা। কোনমতে পালিয়ে বাঁচলো কুকুরের কবল থেকে।

আবার খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে ভয়ে ভয়ে ঘুরপথে রওনা হলো ওরা। পথেই পড়লো শুয়োরের খোঁয়াড়। ভেতরে ঢুকেই প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এলো হাঁক। শুয়োরের পাশে চিত হয়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছে মাফ পটার।

সে-রাতে আর খোঁয়াড়ে থাকতে পারলো না হাক। এক বাড়ির বারান্দায় এসে ঠাঁই নিলো। হাককে রেখে বাড়ি ফিরে এলো টম। পা টিপে টিপে এসে ঢুকলো নিজের ঘরে। কাপড় পাল্টে শুয়ে পড়লো বিছানায়। সিড যে জেগে আছে, জানতে পারলো না।

নয়

সকালে দেরি করে ঘুম ভাঙলো টমের। কাপড় পরে তৈরি হয়ে বেরিয়ে যেতে দেখলো সিডকে। অবাক হলো টম। কোথায় যেন কি একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে! তাকে ডাকা হলো না কেন? নির্দিষ্ট কাপড়চোপড় পরে নির্দিষ্ট কাজে যেতেও চাপাচাপি করেনি কেউ! লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লো সে।

পাঁচ মিনিটেই কাপড় পরা শেষ করে নিচে নেমে এলো টম। অনেক রাতে শুয়েছে, ঘুম ঘুম ভাবটা যাচ্ছে না চোখ থেকে।

টেবিলের ধারেই বসে আছে এখনো সবাই। তবে নাস্তা প্রায় শেষ করে এনেছে। টমের দিকে নীরব চোখ মেলে একবার তাকালো ওরা, তারপর আবার মন দিলো যার যার নিজের খাওয়ায়। কেউ কথা বললো না তার সঙ্গে। বুকের ভেতরে কেমন এক ধরনের ঠাণ্ডা শিরশিরে অনুভূতি অনুভব করলো টম। চুপচাপ এসে বসে পড়লো একটা চেয়ারে। কেউ তার দিকে চেয়ে হাসলো না, কেউ ধমকালো না, কেউ কথা বললো না, কেমন এক ধরনের অস্বস্তিকর নীরবতা। খাবার গিলতেও কষ্ট হলো টমের।

খেয়ে উঠে যার যার মতো চলে গেল সিড আর মেরি। টমকে একপাশে ডেকে নিলেন পলি খালা।

খুশি হয়ে উঠলো টমের মন। এইবার বেত পড়বে তার পিঠে। আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে সবকিছু।

কিন্তু না, বেত পড়লো না। কেঁদে ফেললেন খালা। টম তাঁর হাড়মাংস সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ফেলেছে, বলে বলে বার বার আক্ষেপ করতে লাগলেন।

একেবারে চুপসে গেল টম। বেতের বাড়ির চেয়ে এই শাস্তি অনেক বেশি জ্বালা ধরালো। সে-ও কেঁদে ফেললো। বার বার মাফ চাইতে লাগলো, আর কখনো দুষ্টুমি করবে না। এরপর থেকে একেবারে ভালো, লক্ষ্মী ছেলে হয়ে যাবে।

আর কিছু বললেন না খালা। কিন্তু টম বুঝলো, পুরোপুরি মাফ পায়নি সে। মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল তার। এতোই খারাপ, সিডের ওপর প্রতিশোধ নেবার কথাও ভুলে গেল। তাকে আসতে দেখে গেটের ওপারে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সিড খামোকাই।

বিষণ্ন মনে এসে স্কুলে হাজির হলো টম। গত বিকেলে স্কুল পালানোর জন্যে বেতের বাড়ি পড়লো পিঠে। জো হারপারকেও রেহাই দিলেন না মাস্টার সাহেব।

বেতের বাড়ি খেয়েও টমের বিষণ্নতার কোনরকম পরিবর্তন হলো না। চুপচাপ এসে তার নিজের জায়গায় বসে পড়লো। ডেস্কের ওপর দু'কনুই রেখে হাতের তালুতে থুতনি ঠেকিয়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলো। কোন কিছুতেই আর উৎসাহ নেই তার।

মাস্টার সাহেব পড়া মুখস্থ করার হুকুম দিলেন। বই খুললো টম। দলেমুচড়ে

ডেস্কের ওপর পড়ে আছে একটা কাগজ। হাত দিয়ে ঠেলে ওটাকে ঠেলে ফেলতে গিয়েই থেমে গেল সে। বেশ ভারি। তুলে নিলো টম। কিছু একটা মুড়ে রাখা হয়েছে। খুললো। পেতলের দরজার হাতল। বেকিকে গত দিন দিয়েছিলো এটাই।

পুরোপুরি ভেঙে পড়লো এবারে টম।

দুপুরের দিকে খবরটা শুনে চমকে উঠলো লোকে। দেখতে দেখতে লোকের মুখে মুখে কথাটা প্রচার হয়ে গেল সারা গাঁয়ে। এতোই চমকপ্রদ খবর, সেদিনকার মতো স্কুল ছুটি দিয়ে দিলেন মাস্টার সাহেব।

হস উইলিয়ামের কবর খোঁড়া, ঠেলাগাড়িতে তার লাশ, কবরের পাশে পড়ে আছে ডাক্তার রবিনসনের মৃতদেহ, পাশেই পড়ে আছে মাফ পটারের রক্তাক্ত ছুরি– জানলো গাঁয়ের লোকে। খুনি কে, অনুমান করতে বেগ পেতে হলো না।

গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়লো কবরখানায়। টমের বিষণ্নতা নিমেষে উধাও হয়ে গেল। সে-ও চলে এলো সেখানে। জনতার ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে এসে দাঁড়ালো শেরিফের কাছ থেকে একটু দূরে। হঠাৎ বাহুতে চিমটি কাটলো কেউ। চমকে ফিরে চাইতেই চোখ পড়লো হাকের চোখে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিলো আবার। যেন তাদের দৃষ্টির অর্থ বুঝে ফেলেছে লোকে। কিন্তু তখন দুই বালকের দিকে চোখ নেই জনতার। অন্যদিকে ব্যস্ত ওরা।

চারদিক থেকে নানারকম কথাবার্তা আর মন্তব্য কানে আসছে: 'আহা বেচারা, এভাবে খুন হলো!', 'কবর চোরদের আচ্ছামতো শিক্ষা দিতে হবে!', 'মাফ পটারকে ধরতে পারলে ফাঁসিতে ঝোলাতে হবে!' এবং আরো অনেক কথা।

একটা মুখের ওপর চোখ পড়তেই কেঁপে উঠলো টম। ইনজুন জো।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো কয়েকজন: 'ওই যে! ওই যে! আসছে সে, আসছে!'

'কে? কে আসছে?' চেঁচিয়ে উঠলো গোটা বিশেক কণ্ঠ।

'মাফ পটার!'

'আরে, ও দাঁড়িয়ে পড়েছে! ···পালাচ্ছে! ধরো ধরো!'

ধরা পড়লো মাফ পটার। সরে জায়গা করে দিলো জনতা। টানতে টানতে তাকে নিয়ে আসা হলো কবরের ধারে, শেরিফের কাছে। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে বেচারা পটারের। চোখে আতঙ্ক। ডাক্তারের লাশটার দিকে একবার চেয়েই কেঁপে উঠলো থরথর করে, মুখ ঢাকলো দু'হাতে। কেঁদে ফেললো ঝরঝর করে।

'আমি করিনি! আমি করিনি!' ফোঁপাচ্ছে পটার। 'বিশ্বাস করো তোমরা, আমি খুন করিনি!'

'তাহলে কে করলো?' চেঁচিয়ে উঠলো একজন।

চমকে মুখের ওপর থেকে হাত সরালো পটার। ফিরে চাইতেই চোখ পড়লো ইনজুন জো-র ওপর। সেই করেছে প্রশ্নটা। 'ওহ্ জো, তুমি কসম খেয়েছিলে কখনো...।'

'এটা তোমার ছুরি?' পটারের চোখের সামনে তুলে ধরলেন শেরিফ।

দু'দিক থেকে ধরে না রাখলে পড়েই যেতো পটার। শক্তি একেবারে নিঃশেষ

হয়ে গেছে যেন। হতাশ গলায় বললো জোকে, 'বলো, সব বলে দাও ওদেরকে, জো। আর চুপ করে থেকে কোন লাভ নেই!'

স্তব্ধ, বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিথ্যেবাদী খুনেটার সব কথা শুনলো টম আর হাক। বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথাই বললো জো। টম ভাবলো, এখনো চুপ রয়েছে কেন ঈশ্বর! এখনো বাজ পড়ছে না কেন জো-র মাথায়!

'কেন পালিয়ে গেলে না, পটার?' জিজ্ঞেস করলো একজন। 'কেন এখানে এলে ধরা পড়তে?'

'কি জানি!' বিড়বিড় করে বললো পটার। 'পালিয়েই যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পা দুটো যেন ঠেলে নিয়ে এলো আমাকে এখানে!'

খুনি নিজেই স্বীকার করেছে খুনের কথা। আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি? ডাক্তারের লাশ ঠেলায় তোলার নির্দেশ দিলেন শেরিফ। এগিয়ে এসে হাত লাগালো কয়েকজন। সবার আগে এলো ইনজুন জো। অনেক সাহায্য করলো সে।

আবার বিষণ্ণতায় ভরে গেছে টমের মন। একেবারে চুপচাপ শান্ত হয়ে গেছে সে। কেবলই ভাবে মাফ পটারের কথা। লোকটার জন্যে দারুণ দুঃখ হয় তার, কিন্তু ইনজুন জো-র ভয়ে কাউকে কিছু বলতে পারে না।

রাতে ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখে টম। সকালে সিড জানায়, 'খুন! খুন!' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলো টম। পলি খালার কানে গেল খবর। কিন্তু তিনি অবাক হলেন না। রক্তাক্ত লাশ দেখে এসে দুঃস্বপ্ন দেখেছে টম এতে অবাক হবার কিছু নেই।

কোন কিছুই ভালো লাগে না টমের। খালাকে খুশি করতে স্কুলে যায় রোজ। কিন্তু ওই পর্যন্তই। মাস্টার সাহেব কি পড়ান কি বলেন কিছুই কানে ঢোকে না তার। ফলে মার খেতে হয়। তাতেও যেন কিছুই এসে যায় না তার।

দেখতে দেখতে দু'দিন কেটে গেল। সেদিন পথে আবার দেখা হয়ে গেল হাকলবেরির সঙ্গে। দুজনে ঠিক করলো, মাফ পটারের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

গাঁয়ের শেষে পাহাড়ের গোড়ায় নির্জন জেল। কয়েদী একমাত্র মাফ পটার। ছোট্ট জেলে তাকে ভরে দরজায় তালা দিয়ে দেয়া হয়েছে।

জানালা দিয়ে পটারকে দেখলো টম আর হাক। সাধ্যমতো যা জোগাড় করতে পেরেছে, পটারের জন্যে নিয়ে এসেছে টম। জানালা দিয়েই সেগুলো তুলে দিলো হতভাগা লোকটার হাতে। চোখ ছলছল করে উঠলো পটারের। তার মতো একটা খুনের জন্যে এতোখানি সহানুভূতি দুটো কিশোরের, মনে মনে একটুখানি সান্ত্বনা পেলো যেন সে।

গাঁয়ের কারো কারো মনে ক্ষোভ, ইনজুন জো-কে ধরে পেটানো গেল না। ব্যাটা, লাশ চুরির মতো জঘন্য অপরাধে হাত মিলিয়েও ঠিক পাড় পেয়ে গেল। আসলে, কে শুরু করবে পেটানোর কাজটা? বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে যাবে কে? ইনজুন জো-র গায়ে হাত তোলে, কার এতো বড় হিম্মত?

দশ

আরেকটা ঘটনায় টমের মন আরো খারাপ হয়ে গেল।

কদিন ধরেই স্কুলে আসছে না বেকি থ্যাচার। এলে-এলো-না-এলে-নেই এমন একটা ভাব করে কয়েকদিন কাটিয়ে দিলো টম। শেষে আর পারলো না। পায়ে পায়ে গিয়ে একদিন ঘুরে এলো বেকিদের বাড়ির সামনে থেকে। বেকির দেখা পেলো না। খোঁজ নিয়ে জানলো, বেকির খুব অসুখ। যদি মরে যায়, যদি মরে যায় বেকি! দুনিয়াটা অর্থহীন হয়ে গেল টমের কাছে। যুদ্ধে আর মন রইলো না, এমন কি জলদস্যু হবার ইচ্ছেটাও চলে গেছে মন থেকে। চাকাটায় হাত দেয় না আর, ব্যাটে ধুলো জমতে লাগলো–খেয়ালই নেই টমের।

ব্যাপার দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন পলি খালা। কি হলো ছেলেটার! দুষ্টুমি করে না, জ্বালায় না, একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল হঠাৎ! অসুখ করেনি তো?

নিজের সাধ্যমতো সব রকমের চিকিৎসা চালালেন পলি খালা। নিজের যা যা জানা আছে, একে একে সবই প্রয়োগ করতে লাগলেন। কিছুই হলো না। শেষে অব্যর্থ 'ওয়াটার থেরাপি' চালালেন রোগীর ওপর। সকালে বিরাট এক গামলায় বরফের মতো ঠাণ্ডা পানি নিয়ে তাতে চোবানো হলো টমকে। গামলা থেকে তুলে শুকনো খসখসে তোয়ালে দিয়ে জোরে জোরে ডলে গা মুছে দিলেন খালা। টমের মনে হলো, ডলার চোটে চামড়া ছিলে যাচ্ছে তার, কিন্তু তবু টুঁ শব্দ করলো না সে। এরপর একটা ভিজে চাদর টমের গায়ে জড়ালেন খালা। ওভাবেই নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন কম্বলের তলায়। ঢুকিয়ে রাখলেন অনেকক্ষণ।

পর পর কয়েকদিন চললো এই চিকিৎসা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। রোগ সারলো না টমের। কাটলো না বিষণ্নতা।

এই সময়ই ওষুধটা হাতে এলো খালার। নতুন বেরিয়েছে বাজারে। বেদনানাশক তরল একটা ওষুধ। জিভে ছোঁয়ালেই মনে হয় পুড়ে যাচ্ছে যেন, এতোই ঝাঁঝালো। একবিন্দু জিভে ছুঁইয়েই বুঝে গেলেন খালা, এই ওষুধে না হলে আর কিছুতেই কিছু হবে না। টমকে ডাকলেন তিনি।

দেখে ওষুধটাকে পাত্তাই দিলো না টম। কিন্তু মুখে এক চামচ পড়তেই বিষম খেলো। গলা দিয়ে পোড়াতে পোড়াতে নেমে যাচ্ছে যেন তরল আগুন। লাফিয়ে ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করলো তার। বুঝলো, আর বিষণ্ন হয়ে থাকা চলবে না। কিন্তু সে-ভাব এখুনি দেখানো উচিত হবে না। তাহলে রোজই নিয়মিত তাকে ওই আগুন গেলাবেন খালা। ফন্দি আঁটলো সে। ওষুধটুকু গিলে ফেলে আরেক চামচ চাইলো। জোর করে সেটুকু গিলে নিয়ে চাইলো আবার। জানালো, খুবই ভালো লাগছে তার। আর দিলেন না খালা। একবারে বেশি খাওয়া উচিত না।

খানিক বাদেই এসে আবার এক চামচ ওষুধ চেয়ে খেলো টম। খানিক বাদেই

আবার এলো। বিরক্ত হয়ে উঠলেন খালা। চামচ আর ওষুধের শিশিটা টমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'নিজে নিয়ে খা গিয়ে, যা!'

শিশিটা নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলো টম।

রোজই একবার করে খোঁজ নেন খালা শিশিটার, ওষুধের পরিমাণ দেখে যান। দিনে দিনে কমছে ওষুধ। ধরেই নিলেন, খেয়ে শেষ করছে টম। রোজ যে এক চামচ করে ওষুধ ফেলে দেয়া হয়, এটা জানার কথা নয় পলি খালার।

একদিন ওষুধ ফেলে দেবার সময় এসে হাজির হলো খালার বিড়ালটা। ওষুধ লেগে থাকা চামচটা শুঁকলো। নাকি গলায় মিঁউ মিঁউ করে উঠলো।

'দেখ পিটার, সব কিছুতেই লোভ করিস না,' হুঁশিয়ার করলো টম। 'এ-জিনিস খেতে পারবি না তুই।'

টমের হুঁশিয়ারিতে কিছুই এসে গেল না পিটারের। চামচটা শুঁকতে শুঁকতে আবার আবেদন জানালো সে।

'ঠিক আছে, দিচ্ছি। পরে বলতে পারবি না, হুঁশিয়ার করিনি,' এক চামচ ওষুধ পিটারের দাঁতের ফাঁক দিয়ে মুখের ভেতরে ঢেলে দিলো টম।

চোখের পলকে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো পিটার। নিচে নেমেই টেনিস বলের মতো লাফিয়ে উঠলো আবার। আবার পড়লো। বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে ফোঁস ফোঁস করে উঠলো বার দুই। ছুটলো ঘরের কোণে। পরক্ষণেই ছুটে এলো আবার। আলমারিতে বাড়ি খেলো। লাফিয়ে পিছিয়ে আসতে গিয়ে পড়লো একটা চেয়ারের পায়ায়। আবার সামনে ছুটে এগোতে গিয়ে বাড়ি খেলো খাটের সঙ্গে। লাফিয়ে গিয়ে উঠলো টেবিলে, পাউডারের কৌটো উল্টে ফেললো, ধাক্কা লেগে গড়িয়ে পড়লো আয়না। আবার নেমে এলো টেবিল থেকে। চেঁচাতে লাগলো তীক্ষ্ণস্বরে। ছুটোছুটি করতে লাগলো সারা ঘরে। ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়ে ঝনঝন শব্দে ভাঙতে লাগলো গেলাস, জগ। শেষমেশ আরেকটা চিৎকার করে উঠেই লাফিয়ে উঠলো জানালার চৌকাঠে। এক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল বাইরে।

হাসতে হাসতে মেঝেতে শুয়ে পড়েছে টম। পেট চেপে ধরেছে দু'হাতে।

শব্দ শুনে ছুটতে ছুটতে এলেন পলি খালা। 'টম, বিড়ালটা অমন করছিলো কেনরে?'

'জানি না, খালা,' হাসি থামাতে পারছে না টম।

'কি হয়েছিলো? এমন তো আগে কখনো করেনি পিটার!'

'মেজাজ ভালো হলে এমন করেই থাকে বিড়ালেরা,' আবার হাসতে শুরু করলো টম।

'করেই থাকে!'

'হ্যাঁ, খালা, করেই থাকে। আমার তো তাই ধারণা।'

'তোর ধারণা?'

'হ্যাঁ।'

খুঁজতে শুরু করলেন খালা। তাঁকে বিছানার দিকে এগোতে দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলো টম। ম্যাট্রেসের তলা থেকে চামচটা বের করে আনলেন খালা। তাড়াহুড়োয় ঠিকমতো লুকোতে পারেনি টম, চামচের পেছনের দিকটা বেরিয়ে

ছিলো।

চামচটা হাতে নিয়ে কড়া চোখে তাকালেন খালা। চোখ নামিয়ে নিলো টম। অনুভব করলো, তার কানে হাত পড়েছে। মোচড় লাগলো কানে। জোর টানে আস্তে আস্তে একপাশে কাত হয়ে যাচ্ছে মাথাটা।

'এবার বল হারামজাদা, বেচারা বিড়ালটাকে কষ্ট দিয়েছিস কেন?' ধমকে উঠলেন খালা।

'মায়া লাগলো তাই। ওর তো খালা নেই।'

'খালা নেই! তাতে কি হয়েছে?'

'উফ্‌ফ্, ছাড়ো খালা, লাগছে! ....ওর তো খালা নেই যে ওষুধ খাইয়ে গলা জ্বালিয়ে দেবে। বেচারা খেতে চাইছিলো, দিলাম এক চামচ।'

থমকে গেলেন খালা। হঠাৎ তাঁর চোখ খুলে দিয়েছে আজ পাজী ছেলেটা! তাই তো! বিড়ালকে কষ্ট দিতে পারে যে জিনিস, মানুষকেও কষ্ট দিতে পারে। টমের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করে এসেছেন এতোদিন, ভেবে দুঃখ হলো তাঁর। চোখের কোণে পানি এসে গেল। টমের মাথায় হাত রেখে কোমল গলায় বললেন, 'তোর ভালোর জন্যই আমি কষ্ট দিই তোকে, টম।'

খালার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললো টম, 'জানি খালা। সেকারণেই পিটারকেও কষ্ট দিয়েছি আমি, ওর ভালোর জন্যেই...'

'টম! পাকামো করলে আবার মারবো ধরে! যা, তোর আর ওষুধ খেতে হবে না! একটিবারের জন্যেও যখন ভালো হতে পারবি না...তোকে নিয়ে যে আমি কি করি!'

বেরিয়ে গেলেন খালা।

স্কুল শুরু হবার আগেই সেদিন স্কুলে পৌঁছে গেল টম। এটা একটা ব্যতিক্রম। টমকে দেখে এগিয়ে এলো তার কয়েকজন বন্ধু। খেলতে ডাকলো। রাজি হলো না টম। জানালো, সে অসুস্থ। তাকে দেখাচ্ছেও অসুস্থ। গেটের কাছে একটা বেঞ্চিতে বসে পথের দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

একে একে আসছে ছাত্রছাত্রীরা। কিন্তু টমের বহু আকাঙ্ক্ষিত ফ্রক এবং সোনালি বেণী আর আসে না। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে যাবে টম, এই সময় দেখা গেল তাকে। নিমেষে সকল ক্লান্তি চলে গেল টমের, উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মুখচোখ।

গেটের কাছে চলে এসেছে বেকি। টমের সামনে দিয়ে হেঁটে এগিয়ে গেল, কিন্তু ফিরেও চাইলো না। উঠে পড়লো টম। ছুটলো ছেলেদের মাঝ দিয়ে। একে ধাক্কা মারলো, ওকে ল্যাঙ মেরে ফেলে দিলো, ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ে ডিগবাজি খেলো বার দুই। সোজা হয়ে চাইলো বেকির দিকে। খেয়ালই নেই যেন বেকির। আবার ডিগবাজি খেতে শুরু করলো টম। গিয়ে পড়লো একেবারে বেকির পায়ের ওপর।

পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিলো বেকি। নাক কুঁচকে বললো, 'কিছু কিছু লোক নিজেকে খুব চালাক মনে করে! শরম নেই কিচ্ছু নেই, খালি নিজেকে আহির করার চেষ্টা! হুঁহ্!'

কান লাল হয়ে গেল টমের। কোনমতে উঠে দাঁড়ালো সে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে যেন তাকে।

এগারো

মনস্থির করে ফেলেছে টম। কেউ তাকে চায় না, কেউ তাকে ভালোবাসে না, সবাই তাকে দূর দূর করে, সবাই তার জ্বালায় অস্থির, কাজেই আর থাকবে না সে এখানে। চলে যাবে যেদিকে দু'চোখ চায়। স্কুল করে আর কি হবে? বেরিয়ে এলো সে, নেমে এলো পথে। এগিয়ে চললো।

পথে দেখা হয়ে গেল প্রিয় বন্ধু জো হারপারের সঙ্গে। জো-র মুখচোখও শুকনো, মন ভালো না। ও-ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। সর চুরি করে খেয়েছে বলে সাংঘাতিক পিটিয়েছে তাকে মা।

দু'বন্ধুর একই সমস্যা। একই পথে চললো ওরা। আর থাকবে না এ-গাঁয়ে।

চলতে চলতেই আলোচনা চালালো দু'বন্ধু। বেরিয়ে তো এসেছে, এখন কি করা যায়? কোন পেশায় নিয়োজিত করা যায় নিজেদেরকে? জো বললো, পাহাড়ের কোন গুহায় গিয়ে ঢুকে পড়বে। সন্ন্যাসী হয়েই কাটিয়ে দেবে বাকি জীবনটা। কিন্তু সারা জীবন আলসে হয়ে থাকতে সাড়া দিলো না টমের মন। তার চেয়ে বরং জলদস্যু হওয়া যাক, পরামর্শ দিলো সে। রাজি হয়ে গেল জো। ঠিক হলো, জলদস্যুই হবে ওরা। কিন্তু ঘাঁটি বানাবে কোথায়?

সেইন্ট পিটার্সবার্গের মাইল তিনেক ভাটিতে এক জায়গায় মাইল খানেকের বেশি চওড়া হয়ে গেছে মিসিসিপি। সরু লম্বা একটা দ্বীপ আছে ওখানে নদীর বুকে। দ্বীপের একপাশে বালির চড়া নেমে গেছে অগভীর পানিতে। জংলা নির্জন দ্বীপ। মানুষ আসে না। দ্বীপটার নাম জ্যাকসনস আইল্যাণ্ড। ঘাঁটি স্থাপনের জন্যে উপযুক্ত জায়গা। কিন্তু জলদস্যু হয়ে কাদের ওপর দস্যুতা চালাবে, একবারও মাথায় এলো না দুজনের। এই সময়ই হাকলবেরির কথা মনে হলো টমের।

এক পায়ে খাড়া হয়ে ছিলো যেন হাক, টমের প্রস্তাব শুনে সঙ্গে সঙ্গে রাজি। ঠিক হলো, মাঝরাতে নদীর মাইল দুয়েক উজানে এক জায়গায় মিলিত হবে ওরা। নদী পারাপারের জন্যে একটা কাঠের ছোট ভেলা আছে ওখানে। ওটাই চুরি করবে ওরা, ওতে করেই চলে যাবে জ্যাকসনস আইল্যাণ্ডে। জো আর টম খাবার-দাবার নিয়ে আসবে সঙ্গে করে। আর আনবে ছুরি, বড়শি আর সুতো।

বিকেলের আগেই গাঁয়ের বালক মহলে রটে গেল একটা বিশেষ সংবাদ। শিগগিরই একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সবাই শোনার জন্যে যেন প্রস্তুত থাকে।

মাঝরাতের আর বেশি বাকি নেই। নদীর পারে এসে দাঁড়ালো টম। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে শুয়োরের বিশাল এক টুকরো সেদ্ধ মাংস। কিছু মিষ্টি রুটিও এনেছে।

নীরব নিঝুম রাত। আকাশে তারার ঝিকিমিকি। সামনে বিছিয়ে আছে নদীর কালো পানি। কান খাড়া করে শুনলো টম। কোন সাড়া নেই কোথাও। লম্বা চাপা এক শিস দিলো সে।

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব এলো পেছনের ঝোপ থেকে।

আবার দু'বার শিস দিলো টম।

সাড়া এলো তিনবার শিস দিয়ে। তারপরই প্রয়াসকৃত ভারি গলায় কথা বলে উঠলো কেউ, 'কে যায়?'

'টম সয়্যার, স্প্যানিশ মেইনের কালো প্রতিহিংসা। তোমরা?'

'লাল-পাঞ্জা হাক ফিন এবং সাগরের আতঙ্ক জো হারপার।'

জলদস্যুদের বই পড়ে এসব গালভরা পদবী জেনেছে টম, শিখিয়েছে বন্ধুদের। 'সংকেত?'

'রক্ত!'

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো লাল পাঞ্জা আর সাগরের আতঙ্ক। নদীর ধার ধরে এগিয়ে চললো তিন জলদস্যু। ওদের প্রথম মিশন: কাঠের ভেলা লুট।

ডাকাতি নয়, চুরি করে বাড়ি থেকে বড় একটুকরো গরুর সেদ্ধ মাংস নিয়ে এসেছে সাগরের আতঙ্ক। অন্যের বাড়ি থেকে একটা সসপ্যান চুরি করে এনেছে লাল পাঞ্জা। আর এনেছে একটা পুরোনো পাইপ, কিছু তামাক পাতা। চলতে চলতে দুই সঙ্গীকে সাধলো হাক, কিন্তু তার মতো খালি পাতা চিবোতে রাজি হলো না ওরা। কালো প্রতিহিংসার মতে, আগুন ছাড়া তামাক জমে না।

আরো শ'খানেক গজ এগিয়ে ভেলার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। উঠে এলো ভেলায়। দড়ি কেটে দিতেই স্রোতের টানে ভাটির দিকে ভেসে চললো ভেলা। নানারকম বিচিত্র শব্দ আর অঙ্গভঙ্গি করে আদেশ দিচ্ছে জলদস্যুদের নেতা স্প্যানিশ মেইনের কালো-প্রতিহিংসা। নির্দ্বিধায় আদেশ পালন করে চলেছে অন্য দুই জলদস্যু।

স্রোতের টানে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে চলেছে ভেলা। দুলছে বড় বেশি। কাজেই দাঁড় ধরতে হলো হাক আর জো-কে। একবার তীব্র দুলুনি খেয়ে সোজা হয়ে গেল ভেলা। ঘোরাও বন্ধ হয়ে গেল। এগিয়ে চললো সোজা। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে একের পর এক হুকুম জারি করে চলেছে দস্যুনেতা টম সয়্যার।

রাত দুটোর দিকে বালির চড়ায় এসে ঠেকলো ভেলা। দুশো গজ দূরে জঙ্গল। মালপত্র নিয়ে নেমে পড়লো জলদস্যুরা। ভেলার একটা ছেঁড়া পাল আছে, সেটাও নিয়ে নিয়েছে সঙ্গে।

জঙ্গলের ধারে এসে থামলো ওরা। ছেঁড়া পালটা একটা হালকা ঝোপের মাথায় বিছিয়ে দিয়ে ক্যাম্প বানালো। বর্ষায় ওটার নিচে আশ্রয় নিতে পারবে। আপাতত মালপত্রগুলো তাঁবুর তলায় রেখে দিয়ে নিজেরা খোলা আকাশের নিচে শোয়াই ঠিক করলো।

শুকনো কাঠকুটো জোগাড় করে আগুন জ্বালানো হলো। খানিকটা বেকন কেটে নিয়ে ভেজে নিলো একজনে। রুটি কেটে নিয়ে খেতে বসলো জলদস্যুরা।

নির্জন নীরব গভীর বনভূমিতে বসে খেতে খেতে সিদ্ধান্ত নিলো ওরা, এই সুখ ছেড়ে আর কোন দিন সভ্য জগতে ফিরে যাবে না। আগুনের আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে আশপাশের গাছপালা। মাথার ওপর পাতার চাঁদোয়া, আকাশ চোখে পড়ে না।

খাওয়া শেষ করে ঘাসের ওপরই শুয়ে পড়লো ওরা। আগুনের আঁচ লাগছে গায়ে। এক অপূর্ব পুলক অনুভব করলো ওরা, এক অদ্ভুত সুখ।

'খুব ভালো লাগছে আমার!' বললো জো।

'আমারও!' টম বললো। 'এখন আমাদের দেখলে কি ভাববে গাঁয়ের ছেলেরা!'

'ভাববে! আমাদের দলে যোগ দেবার জন্যে পাগল হয়ে উঠবে, না কি বলিস, হাক?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো হাকলবেরি। 'আমারো খুব ভালো লাগছে। পেট ভরে খেলাম। ঘুমাবোও শান্তিতে। ঘাড় ধরে তুলে দেবে না কেউ, তাড়া করেও আসবে না।'

'ঠিক এ-জীবনই আমি চাই,' বললো টম। 'সকাল সকাল উঠে পড়তে হবে না, প্রার্থনা করার ঝামেলা নেই, স্কুলে যেতে হবে না, গা ধুতে হবে না। ওসব অকাজগুলোর কোনোটাই করতে হবে না এখানে। ওসব কিছুই করতে হয় না আসল জলদস্যুদেরও। কিন্তু সাধুসন্ন্যাসীদের এসব সুযোগ নেই। অনেক প্রার্থনা করতে হয়। কোন আনন্দই নেই ওদের জীবনে।'

'ঠিকই বলেছিস, টম,' সায় দিলো জো। 'আগে ভাবিনি। আসলেই সাধু হওয়ার চেয়ে জলদস্যু হওয়া অনেক বেশি আনন্দের।'

'এজন্যেই তো আজকাল আর সাধু হতে চায় না লোকে। সাধুদের পাত্তাই দেয় না কেউ, অথচ জলদস্যু দেখলে কেমন ভয়, কেমন শ্রদ্ধার চোখে তাকায় মানুষ। জলদস্যুরা থাকে আরামে, আর সাধুরা? মাথায়-মুখে ছাই মেখে, চটের কাপড় পরে ভূত সেজে থাকে। যেন একেকটা সঙ...'

'ছাই মাখে কেন রে?' জানতে চাইলো হাক।

'কি জানি! তবে সাধু হতে যদি চাস ছাই মাখতেই হবে তোকে...'

'আমার বয়ে গেছে সাধু হতে!'

পাইপে তামাক পাতা ঠেসে ভরলো হাক। আগুন ধরিয়ে টানতে লাগলো, ধোঁয়া ছাড়ছে ফক ফক করে। মাঝে মধ্যে মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে গলা খাঁকারি দিতে লাগলো বড়দের মতো, ইচ্ছে করে। খানিক পরে বললো, 'আচ্ছা টম, জলসদ্যুদের কি কি কাজ করতে হয়?'

'অনেক অনেক কাজ। জাহাজ দখল করে লুট করতে হয়, পুড়িয়ে দিতে হয় জাহাজ, লুটের মাল সব গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হয়। নির্জন দ্বীপেই ধনরত্ন লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করে ওরা। ভূতেরা পাহারা দেয় ওসব ধনরত্ন। আর হ্যাঁ, জাহাজ পোড়ানোর আগে যাত্রীদেরকে খুন করে ফেলে জলদস্যুরা।'

'আর নিশ্চয় মেয়েদেরকে ধরে দ্বীপে নিয়ে আসে ওরা,' বললো জো। 'শুনেছি, মেয়েমানুষকে খুন করে না জলদস্যু।'

'ঠিকই শুনেছিস,' গর্বিত গলায় বললো টম। 'জলদস্যুরা বীর। বীরেরা কখনো মেয়েমানুষ মারে না।

'শুনেছি, ওদের পোশাকও নাকি খুবই সুন্দর। মণিমুক্তাখচিত ঝলমলে ঢোলা পোশাক।'

'কাদের?' জানতে চাইলো হাক।

'কেন, জলদস্যুদের!'

নিজের পোশাকের ওপর একবার হাত বোলালো হাক। 'তাহলে জলদস্যু হতে পারবো না আমি!' কেমন যেন করুণ শোনালো তার গলা। 'কিন্তু কি করবো, এছাড়া আর কোনো কাপড় তো নেই আমার!'

সান্ত্বনা দিলো ওকে অন্য দুজন। বললো, ভাবনা নেই, দস্যুতা শুরু করলেই টাকা আসতে থাকবে হুড়মুড় করে। যে কোন পোশাক কিনে নিতে পারবে লাল-পাঞ্জা।

ধীরে ধীরে কথাবার্তা থেমে এলো ওদের। চোখ আর খুলে রাখতে পারছে না লালপাঞ্জা, পাইপ খসে পড়লো তার হাত থেকে।

কিন্তু লালপাঞ্জার মতো অতো সহজে ঘুমিয়ে পড়তে পারলো না সাগরের আতঙ্ক আর কালো প্রতিহিংসা। এমন জায়গায় এর আগে কখনো ঘুমায়নি ওরা। তাছাড়া বাড়ি থেকে চুরি করে পালিয়ে আসার জন্যে অনুশোচনা হচ্ছে এখন। কিছুতেই প্রার্থনা করতে চাইছে না, কিন্তু না চাইলেও প্রার্থনা এসে যাচ্ছে মনে, দীর্ঘ দিনের অভ্যাস এতো সহজে ছাড়তে পারলো না। ফলে ঘুম এসেও আসতে চাইছে না। শেষমেশ বাইবেলের শ্লোকের কাছে আত্মসমর্পণ করলো ওরা, চুরি করার জন্যে অনুশোচনা করলো। শান্ত হলো মন। ঘুমিয়ে পড়লো দুজনেই।

বারো

ঘুম ভাঙলো টমের। উঠে বসে দু'হাতে চোখ রগড়ে নিলো সে। চাইলো আশপাশে।

ঠাণ্ডা ধূসর ভোর। কেমন এক অদ্ভুত শান্ত পরিবেশ। একটা পাতা নড়ছে না, কোথাও সামান্যতম শব্দ নেই। পাতায়, ঘাসের ডগায় স্থির হয়ে আছে শিশিরবিন্দু। সাদাটে ছাই জমে আছে আগুনের কুণ্ডের ওপর। নিভে গেছে আগুন। শুধু পাতলা নীলচে ধোঁয়ার একটা রেখা উঠে যাচ্ছে কুণ্ডের মাঝখান থেকে। জো আর হাকের ঘুম ভাঙেনি।

দূরে বনের ভেতর থেকে ডেকে উঠলো ভোরের প্রথম পাখি। জবাব দিলো আরেকটা। শিগগিরই ডাকাডাকি শুরু করে দিলো একদল কাঠঠোকরা। ধীরে ধীরে কাটছে ধূসর আলো, পরিষ্কার হয়ে আসছে আরো। বাড়ছে কোলাহল, জেগে উঠছে বুনো জীবন। কান পেতে শুনছে সব টম, মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে।

সঙ্গী দুই জলদস্যুকে জাগালো টম। কাপড়চোপড় খুলে ফেললো ওরা গা

থেকে। চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে এলো বালির চড়ায়। নেমে পড়লো পানিতে। দূরের ঘুমন্ত গাঁয়ের দিকে তাকিয়ে একবারও মন খারাপ করলো না ওরা। সভ্যতা থেকে দূরে এই বুনো এলাকায় অনেক শান্তিতে আছে। শিগগিরই বিচিত্র খেলায় মেতে উঠলো তিন জলদস্যু।

যতোক্ষণ মন চাইলো, পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করলো ওরা। ক্যাম্পে ফিরে এলো তাজা ঝরঝরে মন নিয়ে। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। শিগগিরই জ্বাললো আগুন। কাছেই একটা ঝর্না আবিষ্কার করলো হাক। খাবার তৈরি করতে বসে গেল জো। মাংস কেটে সসপ্যানে ঢাললো। পাশে বসে রুটি কাটতে লাগলো টম।

কি মনে হতে বড়শি হাতে উঠে গেল হাক। শিগগিরই ফিরে এলো বিশাল দুই কই আর একটা মাগুর মাছ নিয়ে। বাহ্, কি চমৎকার জায়গা! খাবারের কোন অভাব নেই। চাইলেই পাওয়া যায়। এক ধরনের বাদাম পাওয়া গেল বনের ভেতর। দারুণ জমলো নাস্তা।

কড়া হয়ে উঠছে রোদ। গাছের ছায়ায় চিত হয়ে শুয়ে পড়লো তিন জলদস্যু। জিরিয়ে নিচ্ছে। পাইপ ধরিয়ে আয়েস করে টানছে হাক।

শিগগিরই আবার উঠে পড়লো ওরা। বন পরিদর্শনে চললো। অনেক ধরনের গাছ, ঝোপ, লতা জন্মে আছে। তার বেশির ভাগই ওদের অচেনা। গাছে গাছে রঙিন পাখির মেলা। কোথাও ফুটে আছে অজস্র রঙিন ফুল। অসংখ্য প্রজাপতি আর ভোমরা ভিড় করে আছে ফুলের ওপর।

মাইল তিনেক লম্বা দ্বীপটা, চওড়ায় পোয়া মাইলটাক হবে। একপাশে শ' দুই গজ চওড়া নদীর একটা শাখা। সাঁতরে ওপারে চলে যাওয়া যায় ইচ্ছে করলেই।

সারাটা দিন বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ালো তিন বন্ধু। বিকেলের দিকে আরেকবার পানিতে নামলো ওরা, ঝাঁপাঝাঁপি করলো, তারপর ফিরে এলো ক্যাম্পে। শুয়োরের ঠাণ্ডা মাংস আর রুটি দিয়ে খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লো গাছের ছায়ায়। আলাপ-আলোচনা চললো তিনজনের মাঝে। খুব বেশিক্ষণ না, ঝিমিয়ে এলো কথাবার্তা। স্তব্ধ নীরবতা নেমেছে আবার বনের বুকে। ঝিম ধরেছে বাতাসে। একটা পাতাও নড়ছে না। হঠাৎই বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল টমের। জানে না, ঠিক একই কথা ভাবছে জো-ও। এমন কি ভিটে ছাড়া হাকেরও লোকের বাড়ির বারান্দার কথা মনে পড়ে গেছে। নিজে নিজেই ভাবছে ওরা এসব কথা, লজ্জায় প্রকাশ করতে পারছে না।

নীরবতার ভেতর দিয়েই অতি ধীরে ভেসে ভেসে এলো যেন শব্দটা। ভোঁতা একটা একঘেয়ে শব্দ আসছে দূর থেকে। ধীরে ধীরে কাছে আসছে আরো। দেয়াল ঘড়ির চাপা টিকটিকের মতো মনে হচ্ছে এখন। অবাক চোখে একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে তিন জলদস্যু। বুঝতে পারছে না কিসের শব্দ। হঠাৎই 'বুম্‌ম্' করে গর্জে উঠলো কি যেন!

'কি ওটা!' ফিসফিস করে বললো জো।

'বুঝতে পারছি না!' টমও ফিসফিস করেই বললো।

'বাজ না,' মন্তব্য করলো হাক। 'মেঘ নেই, বাজ পড়বে...'

'চুপ, হাক!' বাধা দিলো টম। 'শোন্...'

কয়েক যুগ পেরিয়ে যাবার পর যেন আবার হলো বুম্‌ম্‌ শব্দ।

'চল, দেখি!' উঠে পড়লো টম।

গাছের আড়ালে আড়ালে দ্বীপের একধারে চলে এলো ওরা। নদীর ওপারে গ্রাম। ঝোপের ভেতরে ঢুকে পড়লো তিনজনেই। আস্তে করে সামনের ঝোপ সরিয়ে উঁকি দিলো। মাইলখানেক দূরে ছোট ফেরিবোটটাকে দেখতে পেলো ওরা। স্রোতে ভেসে এগিয়ে আসছে এদিকেই। সামনের চওড়া ডেকে লোক গিজগিজ করছে। এখানে ফেরিবোট নিয়ে কি করছে এতো লোক, বুঝতে পারলো না তিনজনের কেউই।

হঠাৎ বোটের একপাশ থেকে সাদা ধোঁয়ার একটা রেখা ছিটকে বেরোলো, উঠে গেল আকাশের দিকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কানে এলো বুম্‌ম্‌ শব্দ।

'বুঝে গেছি!' বলে উঠলো টম। 'ডুবে গেছে পানিতে কেউ!'

'ঠিক বলেছিস!' সায় দিলো হাক। 'আর বছর গরমের সময় ডুবে মরেছিলো বিল টুনার। বোট নিয়ে বেরিয়েছিলো গাঁয়ের লোকে। কামান দেগেছিলো। রুটি ফেলেছিলো পানিতে। এসব করলে নাকি পানিতে আর ডুবে থাকতে পারে না লাশ, ভেসে ওঠে।'

'আমিও শুনেছি এসব কথা,' বললো জো। 'কিন্তু আজ কাকে খুঁজছে ওরা!'

'আমিও তাই ভাবছি!' বললো হাক। 'কাকে খুঁজছে!'

নীরবে লক্ষ্য করতে লাগলো ওরা। হঠাৎ ভাবনাটা খেলে গেল টমের মাথায়, বলে উঠলো সে, 'বুঝেছি কাদের খুঁজছে। আমাদেরকে।'

মনে মনে নিজেদেরকে হীরো কল্পনা করে নিলো তিন জলদস্যু। গর্বে ফুলে উঠলো বুক। তাদের খুঁজতে বেরিয়েছে এতো লোক! সারা গাঁয়ে নিশ্চয় সাড়া পড়ে গেছে। লোকের মুখে মুখে শুধু তাদের নাম। চুপচাপ ঝোপের ভেতর বসে রইলো ওরা, দেখতে লাগলো।

আরো কিছুক্ষণ খোঁজাখুজি করলো লোকেরা। সাঁঝ ঘনিয়ে এলো। একটা দুটো করে তারা ফুটতে শুরু করেছে আকাশে! ফিরে গেল বোট। ক্যাম্পে ফিরে এলো জলদস্যুরা।

আগুন জ্বেলে খাবার তৈরি করলো। খাওয়া শেষ হলো। নিজেদের মাঝে খানিকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে শুয়ে পড়লো তিন জলদস্যু।

নীরবে পাইপ টানতে টানতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো হাকলবেরি। রাত আরো বাড়লো। জো-ও ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু টমের চোখে ঘুম নেই।

খানিকক্ষণ গড়াগড়ি করে উঠে পড়লো টম। গাছের দুটো সাদা বাকল কুড়িয়ে নিয়ে এসে বসলো আগুনের পাশে। পোড়া কয়লা কুড়িয়ে নিয়ে একটাতে লিখলো: 'আমি ফিরে না এলে এসব জিনিসপত্র সব তোদের।' আরেকটাতে লিখলো অন্য কথা।

পকেট থেকে তার 'ধনরত্ন' সব বার করলো টম। ঘাসের ওপর রেখে হ্যাট চাপা দিলো। বন্ধুদের উদ্দেশ্যে লেখা বাকলটা রাখলো হ্যাটের ওপর। অন্য বাকলটা নিলো জ্যাকেটের পকেটে। তারপর উঠে এলো নিঃশব্দে।

তেরো

বন পেরিয়ে দ্বীপের প্রান্তে এসে দাঁড়ালো টম। একশো গজ পর্যন্ত পানি একেবারেই অগভীর, টমের কোমর পানি। তারপরে বাড়লো গভীরতা। সাঁতরে বাকি একশো গজ পেরিয়ে এসে তীরে উঠলো টম। ভিজে কাপড়েই হেঁটে চললো নদীর ধার ধরে ধরে।

গভীর রাতে গাঁয়ে এসে পৌঁছলো টম। এগিয়ে চললো বাড়ির দিকে। এসে দাঁড়ালো পেছনের বেড়ার ধারে। বেড়া ডিঙোলো। আলো জ্বলছে পলি খালার ঘরের জানালায়, তার মানে জেগে আছেন।

জানালায় উঁকি দিলো টম। সবাই বসে আছে ঘরে। পলি খালা, মেরি, সিড, এমন কি জো হারপারের মা-ও এসেছেন। এপাশে দরজা, দরজার পরে খাট, খাটের ওধারে বসেছে সবাই। পা টিপে টিপে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো টম। আস্তে করে ঠেলা দিলো দরজায়। ভেজানো। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। সবাই পেছন করে আছে, খেয়াল করলো না। চট করে ভেতরে ঢুকে পড়লো টম। বসে পড়লো!

'বাতাস আসছে!' ফিরে চাইলেন পলি খালা। হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত খাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে টম, দেখতে পেলেন না। 'আরে, দরজাটা খুললো কি করে! তাজ্জব ব্যাপার তো! এই সিড, যা তো, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়!'

খাটের তলায় ঢুকে পড়লো টম, আরেকটু হলেই ধরা পড়ে যাচ্ছিলো। চিত হয়ে শুয়ে পড়লো, নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছে। ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে খালার পা ছুঁতে পারে, এতো কাছাকাছি রয়েছে।

'যতো যা-ই বলো,' বললেন খালা। 'খারাপ ছিলো না ছেলেটা, দুষ্টুমি একটু বেশি করতো অবশ্য। কিন্তু খারাপ কিছুই করতো না। মন খুবই ভালো ছিলো ছেলেটার...' কাঁদতে শুরু করলেন খালা।

'ঠিক একই কথা খাটে আমার জো-র বেলায়ও,' কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন মিসেস হারপার। 'কি এমন করেছিলো ছেলেটা! সামান্য একটু সরই তো চুরি করে খেয়েছিলো। আর সরটা এমনিতেই পচা ছিলো, ও না খেলে ফেলে দিতাম। আর এর জন্যেই কি মারই না মারলাম ছেলেটাকে!' অন্তর ফেটে যাচ্ছে যেন তাঁর।

'যেখানেই থাকুক টম, ভালো থাকুক,' বললো সিড। 'তবে ভালো থাকবে বলে আমার মনে হয় না...'

'সি-ড!' খালার জ্বলন্ত চোখ মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছে টম পরিষ্কার। কড়া গলায় বললেন তিনি, 'আমার টমের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলবি না, খবরদার! টম আর নেই, ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন। ওহ্ মিসেস হারপার, আমি ওকে ভুলতে পারছি না কিছুতেই। টম নেই, সবকিছুই ফাঁকা লাগছে আমার!'

'ঈশ্বর দিয়েছেন, আবার তিনিই তাঁর কোলে টেনে নিয়েছেন! কিন্তু আমিও যে ভুলতে পারছি না! কথায় কথায় মেরেছি ছেলেটাকে! এই তো, গত হপ্তায় কয়লা তোলার হাতাটা ভেঙে ফেললো বলে কি মারটাই না মারলাম! এখন দুঃখ হচ্ছে!'

'আমারও। বিড়ালটাকে ব্যথার ওষুধ গিলিয়ে দিয়েছিলো টম। ডলে কান লাল করে দিয়েছি। কয়েকটা গাট্টাও মেরেছি মাথায়। নিশ্চয় খুব ব্যথা পেয়েছিলো! সে দুঃখেই তো ছেলে আমার ঘর ছাড়লো!' ঝরঝর করে আবার কেঁদে ফেললেন খালা।

টমেরও চোখ ভিজে এলো। মেরির ফোঁপানিও শোনা যাচ্ছে। নিজের ওপর ধারণা অনেক উঁচু হয়ে গেল টমের। খাটের তলা থেকে বেরিয়ে খালা আর মেরির দুঃখ ঘুচিয়ে দেবার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করলো সে।

চুপচাপ শুনে যেতে লাগলো টম। জানলো, ভেলা চুরি করে পালিয়েছে ওরা– সকালেই জেনেছে গাঁয়ের লোকে। তাদের ধারণা ছিলো, পাশের গাঁয়ে চলে গেছে ছেলে তিনটে। কিন্তু দুপুরে নদীর ভাটিতে একটা চড়ায় আটকে থাকতে দেখা গেছে ভেলাটাকে। এরপর লোকে ধরেই নিয়েছে, তীব্র স্রোতে উল্টে গিয়েছিলো ভেলা। ডুবে মরেছে তিনটে ছেলেই। বিকেলে লাশ খুঁজতে বেরিয়েছে ওরা। কিন্তু পায়নি। ব্যর্থ হয়ে ফিরেছে। স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে লাশগুলো, এতে কোন সন্দেহ নেই ওদের। আগামী রোববারে গায়েবী প্রার্থনা হবে তিনটে ছেলের উদ্দেশ্যে। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলো টম।

রাত আরো বাড়লো। একে অন্যকে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন পলি খালা আর মিসেস হারপার। শেষে উঠলেন মিসেস হারপার। বাড়ি ফিরে গেলেন।

সিড ঘুমোতে গেল নিজের ঘরে। মেরিও গেল। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন পলি খালা। কিন্তু ঘুম এলো না চোখে। অনেকক্ষণ তাঁর ফোঁপানির শব্দ কানে এলো টমের। নিচু গলায় বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছেন ঈশ্বরের কাছে, টমের জন্যে। অনেক অনেকক্ষণ পরে নীরব হয়ে এলো তাঁর কান্না, থেমে গেল প্রার্থনা। চুপি চুপি খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এলো টম। মোমের আলোয় খালার কান্নাভেজা ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে খুব মায়া হলো তার। ইচ্ছে হলো খালাকে জাগিয়ে তাঁকে কষ্ট দেয়ার জন্যে মাফ চেয়ে নেয়। কিন্তু কি ভেবে আবার থেমে গেল। এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে টুক করে চুমু খেলো খালার গালে। পরক্ষণেই বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। পেছনে ভেজিয়ে দিলো দরজাটা।

নতুন একটা ভাবনা এসেছে টমের মাথায়। আসার সময় ফেরিঘাটে কয়েকটা ছোট নৌকা দেখে এসেছে। আবার পাঁচ-ছয় মাইল না হেঁটে গিয়ে একটা নৌকা চুরি করলে কেমন হয়? ভালোই। জলদস্যু, অন্যের জাহাজ তো দখল করতেই হবে। নৌকাটাকে জাহাজ ভেবে নিলেই হলো।

ফেরিঘাটে চলে এলো টম। নীরব নিঝুম চারদিক। দূরে গাঁয়ের দিক থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ঘেউ ঘেউ। ঢালু পাড় বেয়ে নেমে এলো টম। একটা নৌকায় উঠে পড়লো। বাঁধা দড়ি খুলে দিতেই স্রোতে গা ভাসালো নৌকা। দাঁড় তুলে নিলো টম।

ভেলার চেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটেছে হালকা নৌকা। গম্ভীরমুখে হাল ধরে আছে

স্প্যানিশ মেইনের কালো প্রতিহিংসা দস্যু-সর্দার টম সয়্যার। তরঙ্গসংকুল আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছে যেন সে এমনি ভাবসাব।

জ্যাকসনস আইল্যাণ্ডের চড়ায় এসে ঠেকলো টমের রণতরী। পুবের আকাশে আলো ফুটেছে। নৌকাটা রেখে দেবে ভাবলো একবার টম, কিন্তু পরক্ষণেই নাকচ করে দিলো ভাবনাটা। গাঁয়ের লোকে এখানে নৌকা দেখতে পেলে সব ফাঁস হয়ে যাবে। গ্রেফতার হয়ে আবার যার যার বাড়ির জেলে ফিরে যেতে হবে জলদস্যুদের।

ঘুম ভেঙেছে হাকলবেরির। উঠে টমকে দেখলো না। হ্যাটটা পড়ে আছে। ওটার ওপরে বাকলে কি যেন লেখা, পড়তে জানে না হাক, পড়তে পারলো না। হ্যাটটা তুলেই বড় বড় হয়ে গেল তার চোখ। টমের সব সম্পত্তি জড়ো করে রাখা আছে এক জায়গায়। তাড়াতাড়ি জো-কে জাগালো হাক।

বাকলের লেখা পড়ে শোনালো জো। নেতা গায়েব, ভাবনায় পড়ে গেল দুই জলদস্যু।

'টম কি আর ফিরবে!' হাকের গলায় সন্দেহ।

'ফিরবে, নিশ্চয় ফিরবে,' বললো জো। 'সত্যিকারের জলদস্যু টম। একাজ ছেড়ে সে পালাবে না কিছুতেই। হয়তো গেছে কোনো কাজে। কিন্তু কি কাজ?'

'সে যা-ই হোক, এইসব জিনিসপত্র তো আমাদের?'

'এখনো আমাদের হয়নি। টম লিখেছে, সে ফিরে না এলে ওসব আমাদের হয়ে যাবে...'

'কিন্তু সে ফিরে এসেছে,' নাটকীয়ভাবে একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো টম।

গরুর মাংস আর মাছ দিয়ে নাস্তা সারলো ওরা। খেতে খেতেই নিজের নৈশ অভিযানের কথা সঙ্গীদের সব খুলে বললো টম। শুনে খুব খুশি জো আর হাক।

নাস্তা শেষে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লো টম। সঙ্গীরা গেল মাছ ধরতে। দুপুরে টমকে ঘুম থেকে ডেকে তুললো হাক। রান্না শেষ করে ফেলেছে জো। খেতে বসলো তিন জলদস্যু।

চোদ্দ

খাওয়া শেষে কাছিমের ডিম খুঁজতে বেরোলো তিনজনে।

নদীর চড়ায় ডিম পাড়ে কাছিম। পানির তলা থেকে গর্ত খোঁড়া শুরু করে ওরা। লম্বা সুড়ঙ্গ করে চলে আসে বালির গভীরে, পানির সমতলের ওপরে এনে শেষ করে সুড়ঙ্গ। ঝুড়ির মতো করে গর্ত খোঁড়ে। ওপরে থাকে বালির ছাত। এই গর্তেই একবারে অসংখ্য ডিম পেড়ে রেখে যায় কাছিম।

লাঠি দিয়ে বালির চড়ায় ঠুকে ঠুকে দেখতে লাগলো তিনজনে। কোথাও ফাঁপা

আওয়াজ হলেই বসে পড়ে খুঁড়ে ফেলে। সহজেই বের করে আনে ডিম।

সে রাতে কাছিমের ডিমের চমৎকার ভোজ হলো।

পরের দিন শুক্রবার। সকালে ডিম ভাজা দিয়েই নাস্তা সারলো ওরা। তারপর বেরিয়ে এলো বালির চড়ায়। ছুটোছুটি করে খেললো কিছুক্ষণ। শিগগিরই কাপড় খুলে নেমে পড়লো পানিতে।

সারাটা সকাল খেলেই কাটিয়ে দিলো তিন জলসদ্যু। পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে এলো ক্যাম্পে। শুয়ে পড়লো গাছের ছায়ায়।

গাছের মাথায় কড়া রোদ, কিন্তু গোড়ায় এখানে এসে পৌঁছাতে পারছে না। কেমন যেন বিষণ্ন অলস দুপুর। কোথাও কোন সাড়া নেই, কোথাও একটা পাখি ডাকছে না। কাঠবিড়ালিরও হুটোপুটি নেই। বাতাসে ভেসে উড়ে আসছে প্রজাপতি, আবার চলে যাচ্ছে নিঃশব্দে। কেমন যেন ঝিম ধরে আছে পুরো প্রকৃতি।

নীরবতা ভাঙলো টম। 'আমার বিশ্বাস, এই দ্বীপে জলদস্যু এসেছিলোই। নিশ্চয় কোথাও না কোথাও ধনরত্ন লুকিয়ে রেখেছে ওরা। ভালো করে খুঁজলেই পেয়ে যাবো। কাঠের সিন্দুক নিশ্চয় পচে গেছে এতোদিনে। কিন্তু ভেতরে সোনা আর রূপার মোহরগুলো ঠিকই থাকবে। যদি পেয়ে যাই...এই, তোদের কি মনে হয়?'

তেমন কোন সাড়া এলো না দুজনের কাছ থেকে।

নানাভাবে সঙ্গীদের কৌতূহল জাগানোর চেষ্টা করলো টম, ব্যর্থ হলো।

হঠাৎ উঠে বসলো জো। 'যথেষ্ট হয়েছে! চল বাড়ি ফিরে যাই এবার। যা একা একা লাগছে এখানে!'

'না না বাড়ি ফিরে যাবো কেন?' বললো টম। 'আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। কি আনন্দেই আছি আমরা এখানে! মাছ ধরার কথাটাই ভেবে দেখ?'

'চুলোয় যাক মাছ ধরা। আমি বাড়ি ফিরে যাবো।'

'কিন্তু জো, সাঁতারের জন্যে এতো ভালো জায়গা আর কোথায় পাবি?'

'সাঁতরাতে আর ভালো লাগে না আমার। আমি বাড়ি ফিরে যাবো।'

'আহাহা, বাচ্চা খোকা! মাকে দেখতে খুব মন কাঁদছে বুঝি?'

'হ্যাঁ কাঁদছে। তোরও কাঁদতো, যদি তোর মা থাকতো। আর আমাকে বাচ্চা খোকা বলছিস কেন? তুই কোথাকার বুড়ো রে?' খেপে উঠলো জো।

'ঠিক আছে ঠিক আছে, খোকাবাবু বাড়িই ফিরে যাক। মায়ের কোলে চড়ে বসুকগে। আমরা এখানেই ভালো আছি, কি বলিস হাক?'

'হ্যাঁ–আ!' জোর নেই হাকের গলায়।

'যতোদিন বেঁচে থাকি তোর সঙ্গে আমার আড়ি,' টমকে বলে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো জো। 'এই যে আমি যাচ্ছি!' কাপড় পরতে শুরু করলো সে।

'আরে যা যা!' বললো টম। 'তোকে ছাড়াই চলবে আমাদের। যা না, লোকের হাসির খোরাক হ গিয়ে। আহা, কি আমার জলদস্যু রে। কাঁদুনে খোকার আবার জলদস্যু হবার শখ! হাক আর আমি এখানেই থাকবো। তোকে চাই না। যা।'

বলছে বটে, কিন্তু নিজেরও অস্বস্তি লাগছে টমের। জো-কে কাপড় পরতে

দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। হাকের ভাবসাবও বেশি সুবিধের মনে হচ্ছে না।

'আমি চললাম,' বলেই ঘুরে দাঁড়ালো জো। হাঁটতে শুরু করলো।

হাকের দিকে চাইলো টম।

চোখ নামিয়ে নিলো হাক, 'আমিও যেতে চাই, টম। এমনিতেই বড় একা লাগে এখানে। এখন তো আরো বেশি লাগবে। টম, চল আমরাও চলে যাই।

'আমি যাবো না। ইচ্ছে করলে তুইও যেতে পারিস। আমি এখানেই থাকবো।'

'টম, তাহলে আমি চলেই যাই।'

'যা না, কে আটকে রেখেছে তোকে?'

কাপড় পরতে শুরু করলো হাক। 'টম, চলে এলেই ভালো করতি। ভেবে দেখ। চড়ার ধারে অপেক্ষা করবো আমরা।'

'খামোকা অপেক্ষা করবি।'

কাপড় পরা শেষ করলো হাক। হাঁটতে শুরু করলো।

ওদের সঙ্গে চলে যাবার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করলো টম। ওর ধারণা, শেষ পর্যন্ত যাবে না হাক আর জো। কিন্তু থামলো না ওরা। হঠাৎ পরিবেশটা বড় বেশি একাকী মনে হলো টমের। আর পারলো না সে। এক লাফে উঠে ছুটলো সঙ্গীদের পেছনে। চেঁচিয়ে ডাকলো, 'এই দাঁড়া! কথা আছে!'

দাঁড়িয়ে পড়লো হাক আর জো। ফিরে চাইলো।

ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো টম। কথা বলতে লাগলো ওদের সঙ্গে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে টমের কথা শুনলো অন্য দুজন। তারপর একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, 'দারুণ! আগে বলিসনি কেন?'

আবার ফিরে এলো ওরা ক্যাম্পে। খেলায় মেতে উঠলো।

পনেরো

বিষণ্ন এক শনিবারের বিকেল। ছোট্ট গাঁয়ের কারো মুখে হাসি নেই। সবারই মন খারাপ।

কেবলই কাঁদছেন পলি খালা আর মিসেস হারপার। একের পর এক লোক আসছে তাঁদের কাছে, সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে।

ছেলেমেয়েরাও সব বিষণ্ন। কারো মুখে হাসি নেই। খেলছে না। হৈ-চৈ করছে না। সব চুপচাপ।

নির্জন স্কুল প্রাঙ্গণে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে বেকি থ্যাচার। ভীষণ মন খারাপ। খালি কান্না পাচ্ছে। ইস্, এখন যদি টম থাকতো! পিতলের দরজার হাতলটা অন্তত থাকলেও মনকে বোঝানো যেতো। যদি কোনভাবে আবার ফিরে আসতে পারতো টম! কিন্তু না, আর কোন দিন ফিরে আসবে না সে! আর পারলো না বেকি। কেঁদে ফেললো ঝরঝর করে।

পলি খালার বাড়ির সামনে বেড়ার ধারে জটলা করছে একদল ছেলে, সব টমের বয়েসী। সবাই আলোচনা করছে হারিয়ে যাওয়া ছেলে তিনটের কথা। একজন বললো, 'টমের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে এখানে।' আরেকজন জানালো, নদীর আরো কাছাকাছি তার সঙ্গে শেষ কথা বলেছে টম। অন্য আরেকজন বললো, একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে এ-খবরটা টমই দিয়েছে আমাকে।

আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে ছেলের দল। একেকজন একেক কথা বলছে। তার সবই টম কিংবা জো-কে ঘিরে।

একটা ছেলে, কিছুই বলার নেই তার। জো কিংবা টমের সঙ্গে কোন কথাই হয়নি তার ওরা হারিয়ে যাবার দিন। কিন্তু কিছু একটা বলতেই হয়। বলে বসলো, 'আমাকে ধরে একদিন খুব পিটিয়েছিলো টম।'

ছেলেটা ভেবেছিলো, খুব একচোট বাহবা নিয়ে নেবে। কিন্তু ব্যর্থ হলো। দেখা গেল, ওই বিশেষ ব্যাপারেও তার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছে আর সবাই।

পরদিন সকালে নিরানন্দতার মাঝ দিয়ে শেষ হলো রোববারের স্কুল। অন্যদিনের মতো বাজলো না আজ গির্জার ঘণ্টা, একটা নির্দিষ্ট লয়ে একের পর এক বাজতে লাগলো, আরো বিষণ্ন করে তুললো পরিবেশ। প্রকৃতির চোখে যেন পানি টলমল করছে, ঝরে পড়বে যে কোনো সময়।

একের পর এক আসছে লোকেরা, জড়ো হচ্ছে সামনের আঙ্গিনায়। ভেতরে ঢুকতে শুরু করলো ওরা। কারো মুখে কোনো কথা নেই, মাথা নিচু। পিনপতন নীরবতা গির্জার ভেতরে। ফিসফিস করেও কথা বলছে না কেউ। মাড় দেয়া কাপড়ের খসখস পরিষ্কার কানে আসছে। আসনে বসে পড়ছে লোকেরা।

সিড আর মেরির হাত ধরে এসে ঢুকলেন পলি খালা। তাঁর পিছু পিছুই ঢুকলো হারপার পরিবার। এদের সবার পরনেই কালো পোশাক।

মঞ্চে উঠলেন পাদ্রী। শান্ত, গম্ভীর। ফুঁপিয়ে উঠলো একজন, যোগ হলো আরো কয়েকজন। সামনে একটা হাত বাড়িয়ে শান্ত হবার অনুরোধ জানালেন পাদ্রী। বাইবেল খুলে পাঠ শুরু করলেন: 'আই অ্যাম দ্য রিজারেকশন অফ লাইফ...'

শ্লোক পাঠ শেষে তিনটে ছেলের ওপর ছোটখাটো বক্তৃতা দিলেন পাদ্রী। গাঁয়ের সবারই চোখ আজ অকস্মাৎ খুলে গেল যেন। টম, জো কিংবা হাক আর দুষ্টু ছেলে নয় ওদের চোখে। ছেলেগুলোকে খামোকাই দূর দূর করেছে বলে আজ দুঃখ হলো তাদের। পানি এসে গেল অনেকের চোখেই। তিনটে 'ভালো' ছেলের আত্মার মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করে চললেন পাদ্রী।

গ্যালারির পেছনে মৃদু একটা খসখস শব্দ হলো, কেউ খেয়াল করলো না। গির্জার দরজা খোলার মৃদু শব্দ উঠলো। দু'গাল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে পাদ্রীর, রুমাল দিয়ে মুছে সামনে চেয়েই স্থির হয়ে গেলেন।

পাদ্রীর দৃষ্টি অনুসরণ করে ফিরে চাইলো একজোড়া চোখ, আরেক জোড়া, তারপর আরেক জোড়া। স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ছেলে তিনটে, যাদের আত্মার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা শেষ হলো এইমাত্র।

লাফ দিয়ে উঠলেন পলি খালা, মেরি, মিসেস হারপার। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো যার যার নয়নের মণিকে। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলো।

হাঁ করে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে হাকলবেরি। অসংখ্য দৃষ্টির তীর যেন তাকেই বিদ্ধ করছে শুধু, নিজেকে বড়ই অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছে তার এই পরিবেশে। মহা অস্বস্তিতে ভরে গেল মন। পায়ে পায়ে পিছিয়ে যেতে লাগলো সে, বেরিয়ে যাবে।

খপ করে হাকের একটা হাত চেপে ধরলো টম। 'খালা, এটা খুব খারাপ দেখাচ্ছে। হাককেও তোমাদের আদর করা উচিত।'

'ঠিক! তোকে দেখেও খুব খুশি লাগছে, হাক। আহা মা-মরা ছেলে!' হাককে কাছে টানলেন পলি খালা।

মায়ের আদর কখনো পায়নি হাক. এ-ব্যবহারের সঙ্গে একেবারেই অপরিচিত। অস্বস্তি আরো বাড়লো তার।

হঠাৎ শোনা গেল পাদ্রীর জোরালো গলা: 'ঈশ্বরের গুণগান করো সবাই, গাও প্রাণ খুলে!'

কোরাস গলায় 'ওল্ড হানড্রেড' যেন ফেটে পড়লো হলের ভেতরে। খানিক আগের থমথমে পরিবেশ আর নেই, একেবারে হালকা হয়ে গেছে। সবার মনই খুশিতে উদ্বেল।

মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দুর্দান্ত জলদস্যু স্প্যানিশ মেইনের কালো প্রতিহিংসা। গর্বে ফুলে ফুলে উঠছে বুক।

প্রার্থনা শুরু হয়েছিলো চরম বিষণ্নতার মধ্যে দিয়ে, শেষ হলো ঠিক তার উল্টো পরিবেশে।

দল বেঁধে গির্জা থেকে বেরিয়ে এলো সবাই।

টমের হাত ধরে বাড়ির দিকে হাঁটলেন পলি খালা। প্রায় প্রতি মুহূর্তেই নিচু হয়ে চুমু খাচ্ছেন টমকে। এক ঘণ্টায় যতগুলো চুমু উপহার পেলো টম, এক বছরেও তা পায়নি কখনো।

ষোলো

এটাই ছিলো টমের পরিকল্পনা। নাটকীয় ভাবে এসে হাজির হবে ওদেরই জন্যে আয়োজিত শোক সভায়, গির্জায় সকল লোকের সামনে। এই রোমাঞ্চকর পরিকল্পনার কথা বলেই সেদিন ঠেকিয়েছিলো জো আর হাককে।

আগের দিন সন্ধ্যায় ভেসে যাওয়া একটা শুকনো কাঠের গুঁড়ি ঠেকিয়েছিলো ওরা। ওতে চড়েই পাড়ি দিয়েছে তুমুল বর্ষণে ফুলেফেঁপে ওঠা মিসৌরি নদী। গাঁয়ে এসে ঢুকেছে রাতের বেলা। গির্জায় ঢুকে গ্যালারির বেঞ্চে শুয়ে রাত কাটিয়েছে। সকালে লোকজন আসার আগেই গিয়ে লুকিয়ে পড়েছিলো গির্জার পেছনে। ঠিক সময়ে দরজা খুলে হাজির হয়েছে হলে।

চমৎকার কাটলো রোববার সারাটা দিন।

সোমবার সকাল। নাস্তা খাচ্ছে টম। তার দু'পাশে বসে আছেন পলি খালা আর মেরি। টমকে খুশি রাখার চেষ্টা করছে দুজনেই। তার কোন ইচ্ছেই অপূর্ণ থাকছে না। এক সময় বললেন খালা, 'কাজটা ভালো করিসনি, টম। পুরো এক হপ্তা সবাইকে ভুগিয়েছিস। তোরা ভালো আছিস কোনভাবে জানিয়ে দিলেই পারতি।'

'হ্যাঁ, টম, জানিয়ে দিলেই পারতি,' বললো মেরি। 'আমি জানি জানাতি। আসলে খেয়াল হয়নি কথাটা তোর।'

'হয়েছে। তোমাদেরকে স্বপ্নেও দেখেছি আমি,' খাবার চিবুতে চিবুতে বললো টম।

'সে তো একটা বিড়ালেও দেখে,' বললো খালা। 'এতে প্রমাণ হয় না তুই আমাদের ভালোবাসিস। তা হ্যাঁরে, কি দেখেছিস?'

'বুধবার রাতে স্বপ্নে দেখলাম ওই বিছানাটার ওপর বসে আছো তুমি। কাঠের বাক্সটার ওপর বসেছে সিড, তার পাশে মেরি।'

'হ্যাঁ, বসেছিলাম। ও-রকম প্রায়ই বসি আমরা।'

'জো-র মাও বসেছিলো তোমাদের সঙ্গে, দেখেছি আমি স্বপ্নে।'

'ঠিকই বলেছিস! আর কি দেখেছিস, টম?'

'আরো কি কি জানি দেখলাম, মনে হয়েও হতে চাইছে না।'

'চেষ্টা করে দেখ মনে করতে পারিস কিনা।'

'মনে হচ্ছে...মনে হচ্ছে মোমবাতিটায় জোর হাওয়া লেগেছিলো...নিভু নিভু হয়ে যাচ্ছিলো...'

'তারপর? তারপর কি হলো? মনে করার চেষ্টা কর! ভালো করে চেষ্টা কর!'

দু'হাতে কপাল চেপে ধরে চুপ করে বসে রইলো টম। গভীর চিন্তার পর মনে পড়েছে যেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। মোমটা নিভে যাচ্ছিলো। দরজা খুলে গিয়ে বাতাস আসছিলো তাই।'

'বলে যা টম, বলে যা!'

'দরজাটা খুলে যাওয়ায় অবাক হয়েছিলে তুমি।

'তাই তো! অবাকই তো হয়েছিলাম, না মেরি? বলে যা টম!'

'হ্যাঁ সব মনে পড়ছে আমার। সিডকে দরজা বন্ধ করে দিতে বলেছিলে।'

'সব একেবারে ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। কখনো কখনো আজব কিছু ঘটে যায় পৃথিবীতে, কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারি না আমি সেরেনি হারপারকে। তারপর কি দেখলি?'

'সব এখন দিনের মতো পরিষ্কার আমার কাছে। বলেছিলে: খারাপ ছিলো না খেলাটা। ...মন খুবই ভালো ছিলো...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছিলাম! তারপর?'

'তারপর কাঁদতে শুরু করলে তুমি।'

'হ্যাঁ। শুধু তখনই না, তোর জন্যে আরো অনেক কেঁদেছি আমি। তারপর?'

'জো-র মাও কাঁদতে শুরু করলো। সামান্য একটু পচা সর চুরি করে খেয়েছে

বলে মেরেছে জোকে, সেজন্যে দুঃখ করতে লাগলো। সরটা নাকি এমনিতেই ফেলে দিতো...'

'থামলি কেন, বল! তোর ওপর প্রেতাত্মা ভর করেছিলো, টম!'

'তারপর সিড বললো...'

'আমি কিচ্ছু বলিনি!' বাধা দিয়ে ওপাশ থেকে বলে উঠলো সিড।

'হ্যাঁ, বলেছিলি তুই, সিড,' বললো মেরি।

'চুপ কর সিড। কথা বলতে দে ওকে,' বললো পলি খালা। 'সিড কি বলেছিলো রে, টম?'

'বলেছিলো, যেখানেই থাকুক টম, ভালো থাকুক। তবে ভালো হয়ে থাকবে বলে আমার মনে হয় না...'

'ঠিক! এক্কেবারে একথাগুলোই তুই বলেছিলি, সিড!'

'সিডকে ধমকে উঠেছিলে তুমি, খালা।'

'ঠিক, ঠিক বলেছিস! প্রেতাত্মা না, তোর ওপর দেবতা ভর করেছিলেন, টম। সব ঠিকঠাক দেখিয়েছেন তোকে।'

'জো-র মা বলেছে, কয়লা তোলার হাতা ভেঙে ফেলেছিলো বলে খুব পিটিয়েছিলো জোকে। পিটারকে ওষুধ খাইয়েছি বলে আমার কান টেনেছিলে, সেকথা জো-র মাকে বলেছো তুমি...'

'মনে হচ্ছে যেন তখন এ-ঘরেই ছিলি তুই!'

'তা-তো ছিলামই, স্বপ্নে। এরপর আরো অনেক কথাবার্তা বলেছো তোমরা। আমরা নদীতে ডুবে মারা গেছি, রোববারে গায়েবী প্রার্থনা হবে আমাদের আত্মার উদ্দেশ্যে। প্রচুর কেঁদেছিলে তুমি আর জো-র মা।'

'তারপরেও নিশ্চয় আরো দেখেছিস?'

'দেখেছি। জো-র মা চলে গেল। সিড আর মেরি'পা চলে গেল। তুমি শুয়ে পড়লে। কিন্তু ঘুম আর আসে না। কেবলই কাঁদছো কেবলই কাঁদছো, প্রার্থনা করছো আমার জন্যে। তারপর ঘুমিয়ে পড়লে এক সময়। দেবদূতের মতো বাতাসে ডানা মেলে উড়ে এলাম আমি তোমার কাছে। তোমার ঘুমন্ত মুখ দেখে খুব মায়া লাগলো। তোমাকে চুমু খেলাম। তারপরই ভেঙে গেল স্বপ্ন...'

'তাই করেছিলি! যা তোর সব দোষ আমি মাফ করে দিলাম!' টমকে জড়িয়ে ধরলেন পলি খালা। খালার কোল থেকে আড়চোখে সিডের দিকে তাকালো টম। ঈর্ষায় কালো হয়ে গেছে সিডের মুখ।

'কেমন...কেমন যেন...বিশ্বাস হতে চায় না...' বিড়বিড় করলো সিড।

'চুপ কর, সিড!' এক ধমকে সিডকে থামিয়ে দিলেন খালা। 'কেন হয় না, শুনি! সব হয় সব হয়, ঈশ্বর করলেই হয়!' বড় একটা আপেল টমের হাতে তুলে দিলেন খালা। 'নে, তোর জন্যে তুলে রেখেছিলাম। যা বাবা, স্কুলে যা এখন। সিড, মেরি, বসে রইলি কেন? স্কুলে যা।'

স্কুলে রওনা হয়ে গেল তিনটে ছেলে-মেয়ে। মিসেস হারপারের বাড়ি রওনা হলেন পলি খালা। টমের আজব স্বপ্নের কথা খুলে বলবেন সব। আজ মিসেস হারপারকে আধিভৌতিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিয়েই ছাড়বেন।

আগে আগে চলেছে মেরি। তার পেছনে সিড, ভাবতে ভাবতে চলেছে সে: না, এটা হতে পারে না! বিশ্বাস হয় না। এতোবড় একটা স্বপ্ন দেখলো, এতোক্ষণ ধরে, একটা কথা একটা ঘটনাও ভুল করলো না! কোথাও কিছু একটা রহস্য আছে। কিন্তু কি, বুঝতে পারলো না সিড।

সিডের অনেক পেছনে পড়ে গেছে টম। গর্বিত পদক্ষেপ। পথচারীদের কারো দিকেই ফিরে চাইছে না। জলদস্যুনেতার গাম্ভীর্য নিয়ে চলেছে। পথে হেঁটে যাওয়া সব লোকের চোখই যেন আজ দেখছে তাকে, মনে হচ্ছে তার। স্প্যানিশ মেইনের ভয়াবহ কালো-প্রতিহিংসাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখছে যেন সব পথচারীরা, তাই ভাবছে টম।

বয়েসে কম ছেলেদের একটা দল আসছে তার সঙ্গে সঙ্গে। ওদেরকে আজ আর তাড়া করতে যাচ্ছে না টম, সহ্য করে নিচ্ছে। ভয়াবহ জলদস্যুর সঙ্গে সঙ্গে চলতে পেরে নিজেদেরকে গর্বিত মনে করছে ছেলের দল। একে একে আরো অনেকেই এসে যোগ দিচ্ছে। লম্বা লাইন হয়ে গেছে। আগে আগে চলেছে যেন সার্কাসের হাতি, পেছনে বাচ্চা দর্শকের সারি।

লম্বা মিছিলের পুরোধা হয়ে এসে স্কুলের আঙ্গিনায় ঢুকলো টম। আগেই পৌঁছে গেছে জো। তাকে ঘিরে রেখেছিলো একদল ছেলে। টমকে দেখেই সরে এসে তাকে ঘিরে ধরলো ওরা। কম বয়েসী দলটাকে ভাগালো। এগিয়ে এসে টমের পাশে ঠাঁই করে নিলো জো হারপার।

শিগগিরই রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী শোনাতে শুরু করলো টম। গোগ্রাসে গিলতে লাগলো যেন ছেলের দল। কাহিনী শুনে রোমাঞ্চিত হচ্ছে ওরা বার বার, চোখ কপালে উঠে গেছে। ঈর্ষা হচ্ছে অনেকেরই, কিন্তু জানে কখনোই টম সয়্যারের মতো হতে পারবে না ওরা।

কাহিনী অনেক বাকি থাকতেই পকেট থেকে পাইপ বের করলো জো আর টম। আগের দিন বিকেলেই জোগাড় করে দিয়ে গেছে হাক। তামাক দিয়েছে। পাইপে তামাক ভরে আগুন ধরিয়ে ফক ফক করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো জো আর টম। হুঁশিয়ার রইলো, যেন আবার গলার ভেতর ঢুকে না যায় ধোঁয়া। তাজ্জব হয়ে গেল ছেলের দল।

এই সময় এলো বেকি থ্যাচার। একবার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলো টম। ঠিক করলো, মোটেই পাত্তা দেবে না।

ছুটোছুটি শুরু করলো বেকি। কয়েকটা মেয়ের চুলে টান দিয়েই ছুটলো এদিকে। তাড়া করলো তাকে মেয়েগুলো। ছুটতে ছুটতে টমের কাছাকাছি এসে ধরা পড়লো বেকি। হাসছে খিলখিল করে, চোখ নাচাচ্ছে। বার বার চাইছে টমের দিকে। কিন্তু টম নির্বিকার।

আবার ছুটলো বেকি। আবার ধরা পড়লো এসে টমের কাছাকাছি। কয়েকবার করলো এরকম। কিন্তু টম চেয়েও দেখলো না।

টমের কাছাকাছি থেকেই হঠাৎ কনুই দিয়ে গুঁতো মারলো একটা মেয়েকে। আরো জোরে বললো, 'আরে, মেরি অস্টিন! রোববারের স্কুলে দেখলাম না তো

তোমাকে!'

'এসেছিলাম তো!'

'কই, আমি দেখিনি! কোথায় বসেছিলে?'

'মিস পিটারের ক্লাসে, সব সময় তো একই জায়গায় বসি আমি। তোমাকে দেখেছি।'

'তাই! অথচ দেখো, আমি তোমাকে দেখিনি! ওই পিকনিকের কথা বলার জন্যে তোমাকে খুঁজছিলাম।'

'পিকনিক! ওহ্, কি মজা! খরচ কার?'

'আম্মার।'

'তাই নাকি! ইস্, আমাকে যদি সঙ্গে নিতে!'

'নেবো তো। আম্মা বলেছে আমার যাকে খুশি সঙ্গে নিতে পারবো।'

'খুব ভালো! কবে যাচ্ছো?'

'এই তো সামনে ছুটি আসছে না? তখন।'

'সত্যি খুব মজা হবে! অনেক ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নেবে বুঝি?'

'নেবো। আমার সবকজন বন্ধুকেই নেবো,' আড়চোখে টমের দিকে চাইলো বেকি। কিন্তু তার দিকে টমের কান আছে বলে মনে হলো না। নির্বিকারভাবে কথা বলছে সে পাশে বসা অ্যামি লরেন্সের সঙ্গে। জোরে জোরে বলছে জ্যাকসনস আইল্যাণ্ডে ঝড়ের কাহিনী। বিশাল একটা ওক গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিলো ওরা, তিন হাত দূরে ভেঙে পড়েছিলো ডুমুর গাছের বিরাট এক ডাল...

'আমাকে নেবে?' বলে উঠলো গ্রাসি মিলার।

'হ্যাঁ।'

'আমাকে?' জানতে চাইলো স্যালি রোজারস।

'হ্যাঁ,' বললো বেকি।

'আমাকেও?' জিজ্ঞেস করলো সুজি হারপার। 'আর জো?'

'নেবো।'

সবাই জিজ্ঞেস করছে, কাউকেই না বলছে না বেকি। হাততালি আর আনন্দের জোয়ার বইছে বেকিকে ঘিরে। কিন্তু টম নির্বিকার। অ্যামির সঙ্গে একমনে কথা বলে চলেছে সে। হঠাৎ উঠে পড়লো সে। অ্যামিকে টেনে তুললো। বান্ধবীর হাত ধরে চলে গেল মাঠের আরেক দিকে।

বেকির ঠোঁট কাঁপতে লাগলো। পানি এসে গেল চোখে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে কথা বলে চললো বান্ধবীদের সঙ্গে। কিন্তু 'পিকনিকের মজা' একেবারে অদৃশ্য তার ভেতর থেকে। শিগগিরই বান্ধবীদের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলো বেকি। চলে গেল মাঠের নির্জন কোণে। আর কান্না ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না। কাঁদলো ইচ্ছেমতো। স্কুলের ঘণ্টা পড়লো। চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালো সে। চোখে আগুন। এক ঝটকায় সোনালি বেণী কাঁধ থেকে পিঠে নিয়ে ফেললো। মনস্থির করে ফেলেছে, এরপর কি করবে।

চোরা চোখে বেকির ভাবসাব দেখে মুচকে হাসলো টম। কিন্তু হাসি চলে গেল খানিক পরেই।

একটা বেঞ্চিতে বসেছে বেকি। তার পাশে গিয়ে বসেছে আলফ্রেড টেম্পল–সেই নতুন ছেলেটা, যাকে ধরে একদিন পিটিয়েছিলো টম। রাগে ঈর্ষায় শিরার রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে লাগলো তার। একটা ছবির বই মেলে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে গভীর মনোযোগে ছবি দেখছে বেকি আর আলফ্রেড। বুঝতে পারলো টম, ভুল করে ফেলেছে। বেকির সঙ্গে অতোখানি ডাঁট না দেখালেও চলতো। পিকনিকের আলাপের সময়ই আড়ি মিটিয়ে ফেলতে পারতো। ইস্, কেন যে ভুলটা করলো! সব রাগ গিয়ে পড়লো আলফ্রেডের ওপর। সুযোগমতো বাছাধনকে এমন শিক্ষা দেবে...হাত নিশপিশ করতে লাগলো টমের। কিন্তু এটা স্কুল প্রাঙ্গণ। অনেক ছেলের চোখের সামনে এই মুহূর্তে ধরে পেটানো যায় না ফুলবাবুটাকে।

খানিক পরেই ক্লাস শুরু হলো। কয়েক যুগ পরে সেদিন টিফিনের ঘণ্টা পড়লো বলে মনে হলো টমের। ছুটে বেরিয়ে এলো টম। পেছন পেছন এলো অ্যামি। কিন্তু ওর সঙ্গ এখন বিষের মতো লাগছে টমের কাছে। অনেক কষ্টে অ্যামিকে ছাড়ালো সে, চলে গেল আরেক দিকে।

আবার এলো অ্যামি। হঠাৎ মেয়েটাকে ঘৃণা করতে শুরু করলো টম। বাড়ির দিকে চললো।

বেকি ভেবেছিলো, টিফিনের সময় তার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করবে টম। কিন্তু তার দিকে ফিরেও চাইলো না সে। পাত্তাই দিলো না তাকে। আবার কান্না পেলো বেকির।

'এই যে আরেকটা ভালো ছবির বই,' পাশ থেকে বললো আলফ্রেড।

'দুত্তোর ভালো ছবি!' খেঁকিয়ে উঠলো বেকি। 'ভাগো এখান থেকে! তোমাকে, তোমাকে ঘৃণা করি আমি!'

হঠাৎ সব বুঝে ফেললো আলফ্রেড। সে ভেবেছিলো, মন বদলে তাকেই বন্ধু হিসেবে নিয়েছে বেকি, কিন্তু ভুল করেছে সে, মস্ত ভুল। আসলে টমকে কাছে টানার জন্যে তার সঙ্গে অভিনয় করে যাচ্ছিলো বেকি। রাগে জ্বলে উঠলো সে মনে মনে। এক ঝটকায় সরে এলো সেখান থেকে। সব রাগ গিয়ে পড়লো টমের ওপর। জানে, মারামারি করে পারবে না। অন্য ফন্দি করলো সে।

টিফিনের ছুটির সময় ছেলেমেয়েরা যার যার বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেছে। দু'একটি যাই করেও রয়ে গেছে আলফ্রেড, সবাই বেরিয়ে যেতেই উঠলো সে। এদিক ওদিক চেয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মাস্টার সাহেবের ডেস্কের দিকে। স্পেলিং বুকে কালি ঢেলে দিলো। এই সব অকাজের জন্যে আগেও অনেকবার পিটুনি খেয়েছে টম। ক্লাসের আর কোন ছেলে এসব দুষ্টুমি করে না, ভালো করেই জানা আছে মাস্টার সাহেবের। আগামী দিন এসে প্রথমেই টমকে ধরবেন তিনি। বিনা বিচারে পিটুনি লাগাবেন। 'আমি করিনি, আমি করিনি!' বলবেই টম, কিন্তু শুনবেন না মাস্টার সাহেব। কেউ কি আর সহজে নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে? খুশি মনে বেরিয়ে এলো আলফ্রেড। খেয়ালই করলো না, বাইরে থেকে জানালায় উঁকি দিয়ে সবই দেখেছে বেকি থ্যাচার।

সতেরো

মুখ কালো করে বাড়িতে ঢুকলো টম। পলি খালার চেহারা দেখে আঁতকে উঠলো। সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে!

'টম, ইচ্ছে করছে জ্যান্ত ছাল ছাড়াই তোর!'

'কেন, কি করেছি আমি, খালা?'

'কি করিসনি? সেরেনি হারপারের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তোর স্বপ্নের কথা বলে চমকে দেবো। কিন্তু কি লজ্জাটাই না পেলাম! সেরাতে এঘরে খাটের তলায় ঢুকে সব শুনেছিলি তুই, জো বলে দিয়েছে তার মাকে। সেরেনির কাছে বলতে গিয়ে...আমাকে এ-লজ্জাটা না দিলেই কি চলতো না?'

এটা আশা করেনি টম। খালাকে খুব চমকে দিতে পেরেছে বলে খুশি হয়েছিলো। নিজেকে এখন খুব ছোট মনে হচ্ছে। মাথা নিচু করে রইলো সে। শেষে আস্তে করে বললো, 'খালা, কাজটা ভালো করিনি। ভাবিনি তখন।'

'কোন্‌টা ভাবিস তুই? নিজের কথা ছাড়া আর কারো কথা কখনো ভাবিস? আমি যে দুঃখ পাই, কখনো ভেবেছিস?'

'খালা, খুব খারাপ করে ফেলেছি। সেরাতে তোমাদের কষ্ট দেখার জন্যে আসিনি। কসম খোদার।'

'তো কেন এসেছিলি?'

'তোমাদের খামোকা ভাবতে বারণ করতে এসেছিলাম। জানাতে এসেছিলাম ডুবে মরিনি আমরা।'

'তা যদি তুই করতি, আমার চেয়ে সুখী দুনিয়ায় কেউ হতো না। কিন্তু সেজন্যে তুই আসিসনি।'

'সত্যি বলছি খালা, জানাতেই এসেছিলাম।'

'কেন মিছে কথা বলছিস, টম?'

'মিছে কথা বলছি না, খালা। তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে দিতে চাইনি সেজন্যেই এসেছিলাম।'

'তাহলে বলিসনি কেন?'

'বলতাম, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যে গায়েবী প্রার্থনা হবে শুনেই থেমে গিয়েছিলাম। হঠাৎ গির্জায় হাজির হয়ে সবাইকে চমকে দেবার লোভটা সামলাতে পারিনি। তাই আর বাকলটা রেখে যাইনি।'

'কিসের বাকল?'

'যেটাতে লিখে এনেছিলাম, জলদস্যু হতে গিয়েছি আমরা। তোমাকে যখন চুমু খেয়েছিলাম, সত্যি বলছি খালা, ইচ্ছে করছিলো তুমি জেগে উঠে দেখে আমাকে।'

খালার চোয়ালের কঠিন রেখাগুলো নরম হয়ে গেল। নরম হয়ে এলো দৃষ্টি।

'তুই আমাকে চুমো খেয়েছিলি, টম?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'কেন?'

'কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিলে তুমি। খুব মায়া লাগছিলো।'

টম সত্যি কথা বলছে বলেই মনে হলো খালার। 'তাহলে আবার চুমু খা আমাকে,' কাঁপছে তার গলা। 'তারপর খেয়েদেয়ে জলদি যা। ক্লাসের দেরি হয়ে যাবে নইলে।'

টম বেরিয়ে যেতেই আলমারির কাছে গেলেন খালা। একটানে খুলে ফেললেন পাল্লা। হাত বাড়িয়ে আবার ফিরিয়ে নিলেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'না না, দেখবো না! নিশ্চয় মিছে কথা বলেছে! একটা সত্যিও তো বলে না! খামোকা আবার দুঃখ পাবো!'

নিজেকে নিরস্ত করতে পারলেন না খালা। হাত বাড়িয়ে আবার নিলেন জ্যাকেটটা। নিয়েই রেখে দিলেন। আবার নিলেন। আবার রেখে দিলেন।

দু'বার নিয়ে দু'বারই রেখে দিলেন। শেষে আবার টেনে নিলেন। হাত কাঁপছে। ঢুকিয়ে দিলেন জ্যাকেটের পকেটে। শক্ত কি একটা লাগলো। দু'আঙুলে চেপে ধরে বের করে আনলেন জিনিসটা। বাকলের লেখায় একবার চোখ বুলিয়েই হাসি ফুটলো তাঁর মুখে। চোখের কোণে পানি টলমল করে উঠলো। বিড়বিড় করলেন: 'তোকে মাফ করে দিলাম। হাজারো অন্যায় করলেও আর কিচ্ছু বলবো না...'

আঠারো

খালি খালাকে সত্যি কথাগুলো বলতে পেরে হালকা হয়ে গেল টমের মন। খুশি হয়ে উঠলো আবার সে। পথে দেখা হয়ে গেল বেকি থ্যাচারের সঙ্গে। খেয়েদেয়ে স্কুলে ফিরে চলেছে বেকি।

কোনরকম দ্বিধা না রেখেই বেকির কাছে ছুটে গেল টম। 'অন্যায় করে ফেলেছি, বেকি, দুঃখিত। আর কক্ষনো এমন করবো না।'

থেমে টমের দিকে চাইলো বেকি। 'নিজেকে নিয়েই থাকুনগে, মিস্টার টমাস সয়্যার। আপনার সঙ্গে আর কোনো কথা নেই আমার।'

এক ঝটকায় মুখ ফিরিয়ে গটগট করে হেঁটে চলে গেল বেকি।

স্তব্ধ হয়ে গেল টম। ধীরে ধীরে চেপে ধরলো প্রচণ্ড রাগ। মুঠো হয়ে এলো হাত। ভাবতে ভাবতে এগোলো, কেন ছেলে হলো না বেকি? তাহলে রামধোলাই দেয়া যেতো ধরে এখন। জোরে জোরে হেঁটে বেকির পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় দিল একটা বিদ্রূপ ঝাড়লো টম। পেছন থেকে এর জবাব দিলো বেকি। পিছিয়ে

এসে আবার আরেকটা ব্যঙ্গ করলো টম। আরেকটা জবাব পেলো। এমনি করে করে স্কুলের আঙ্গিনায় এসে ঢুকলো দুজনে।

মাঠে না থেমে সোজা এসে ক্লাসে ঢুকে পড়লো বেকি। নির্জন ক্লাসঘর। মাস্টার সাহেবের টেবিলের ধার দিয়ে নিজের আসনের কাছে এগিয়ে যাবার সময় হঠাৎ চোখ পড়লো চাবিটার ওপর। ড্রয়ারের তালায় ঢোকানো। এমন তো কখনো হয় না! নিশ্চয় ভুলে ফেলে গেছেন মাস্টার সাহেব।

ক্লাসের সব ছেলেমেয়েরাই জানে, ওই ড্রয়ারে মাস্টার সাহেবের একটা মহামূল্যবান সম্পদ লুকানো থাকে। একটা বিশেষ বই। বইটার ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে অনেক কিংবদন্তী রয়েছে, কারোটাই কারো সঙ্গে মেলে না। ওরা জানে না, এক সময় ডাক্তার হবার খুবই শখ ছিলো মিস্টার ডবিনসের। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ হয়ে তাঁকে নিয়ে এসেছে সামান্য গ্রাম্য স্কুল মাস্টারীর কাজে।

ড্রয়ারে চাবি লাগানো রয়েছে, ইচ্ছে করলেই খোলা যায়। লোভ সামলাতে পারলো না বেকি। এদিক ওদিক চেয়ে পায়ে পায়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। কাঁপা হাতে মোচড় দিয়ে খুলে ফেললো তালা। আস্তে করে টেনে খুলে আনলো ড্রয়ার। তুলে নিলো বাঁধানো মোটা বইটা। মলাট ওল্টাতেই দেখলো, বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে 'অ্যানাটমি'। কার লেখা, দেখার দরকার মনে করলো না বেকি। দ্রুত উল্টে গেল পাতা। কয়েকটা পাতা ওল্টাতেই বেরোলো একটা ছবি। পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে। মানবদেহের উলঙ্গ ছবি।

গভীর মনোযোগে দেখছিলো বেকি, পেছনে খসখস শব্দে ভীষণ চমকে উঠলো। এসে গেলেন বুঝি মাস্টার সাহেব! তাড়াহুড়োয় বই বন্ধ করার কথাও ভুলে গেল বেকি, খোলা অবস্থায়ই ঠেলে ঢুকিয়ে রাখতে গেল ড্রয়ারে। খোঁচা লেগে ছবিওয়ালা পাতাটার অনেকখানি ছিঁড়ে গেল। তাড়াতাড়ি আবার বই বের করে বন্ধ করে ড্রয়ারে ঢোকালো। তালায় চাবি লাগিয়ে তারপর ফিরে চাইলো। ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে টম।

ফুঁপিয়ে উঠলো বেকি। 'টম সয়্যার, তুমি একটা ছোটলোক! লুকিয়ে দেখ!'

'আমি কি করে জানবো, চুরি করে কিছু দেখছো তুমি?'

'তুমি তো সবই বলে দেবে স্যারকে! আজ মার খেতেই হবে! কি করে সইবো! ...মাগো, আগে কখনো খাইনি...!' দু'হাতে মুখ ঢাকলো বেকি।

চুপ করে রইলো টম। শুনে খুবই অবাক লাগছে তার। কখনো মার খায়নি এটা কি করে সম্ভব!

কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে সিটে বসে পড়লো বেকি।

ঘণ্টা পড়লো। হুড়োহুড়ি করে ক্লাসে এসে ঢুকতে লাগলো ছাত্রছাত্রীর দল।

মাস্টার সাহেব এলেন। আয়েশ করে বসলেন নিজের চেয়ারে। পুরো ঘরে একবার চোখ বোলালেন। চুপ হয়ে গেল পুরো ক্লাস। প্রথমেই স্পেলিং বুক টেনে নিলেন। খুলেই চক্ষু স্থির। ভুরু কুঁচকে চাইলেন ছাত্রদের দিকে। চোখ এসে স্থির হলো টমের ওপর। 'টমাস সয়্যার?'

'স্যার!'

'বইয়ে কালি ফেলেছিস কেন? এদিকে আয়।'
'আমি ফেলিনি, স্যার!'
'আয় এদিকে!'
টমের কোন প্রতিবাদই টিকলো না। বলি বলি করেও বললো না বেকি, কালি ফেলেছে আলফ্রেড টেম্পল। মার খেতেই হলো টমকে।
আরেকটা বই টেনে নিলেন মাস্টার সাহেব। একে ওকে দু'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, কেউই পারলো না। সবাইকে মুখস্থ করতে আদেশ দিলেন তিনি।
পড়া মুখস্থ চলেছে। একটানা গুনগুন শব্দ করে। দুপুরের খাওয়াটা একটু বেশি হয়ে গেছে মাস্টার সাহেবের। শিগগিরই চেয়ারে বসে ঢুলতে শুরু করলেন তিনি। তন্দ্রার ঘোরেই হঠাৎ খেয়াল হলো, কেউই পড়ছে না। চোখ মেললেন তিনি। নিমেষে থেমে গেল আলাপ-আলোচনা। আবার পড়ায় মন দিলো সবাই।
ঘুমানো বাদ দিলেন ডবিনস। ড্রয়ার খুলে অ্যানাটমির বইটা বের করলেন। খামোকা বসে না থেকে একটু পড়ে নেবার ইচ্ছে। স্তব্ধ হয়ে গেল বেকি। আতঙ্কিত চোখ ফেরালো টমের দিকে।
ফিরে চাইলো টম। চোখাচোখি হয়ে গেল। মুচকি হাসলো সে।
কয়েকটা পাতা উল্টেই স্থির হয়ে গেলেন ডবিনস। জ্বলন্ত চোখে তাকালেন পড়ুয়াদের দিকে। 'পাতা কে ছিঁড়েছে?'
চুপ হয়ে গেছে সবাই। পিনপতন নীরবতা। প্রতিটি মুখের ওপর ঘুরছে ডবিনসের চোখ। মুখ দেখে অপরাধী নির্ণয়ের চেষ্টা চালাচ্ছেন। ব্যর্থ হয়ে ধমকে উঠলেন, 'বেনজামিন রোজারস, তুই ছিঁড়েছিস?'
এদিক ওদিক মাথা নাড়লো বেনজামিন। আবার নীরবতা।
'জোসেফ হারপার, তুই?'
'না, স্যার।'
টমের অস্বস্তি বাড়ছে। তাকে বাদ দিয়ে একে একে আর সবাইকে জিজ্ঞেস করে চলেছেন ডবিনস। 'না' করছে সবাই। টম জানে, তার পালাও আসবে। তবে আর সবার মতো 'না' করে সহজে পার পাবে না।
হঠাৎ মেয়েদের দিকে চোখ ফেরালেন ডবিনস। 'অ্যামি লরেন্স?'
জোরে মাথা নাড়লো অ্যামি।
'গ্রেসি মিলার?'
আবার মাথা নাড়ানো।
'সুসান হারপার, তুমি?'
'না স্যার।'
পরের মেয়েটিই বেকি। উত্তেজনায় কাঁপছে টম।
'রেবেকা থ্যাচার, তুমি...আমার দিকে তাকাও...তুমি ছিঁড়েছো?'
রক্ত সরে গেছে বেকির মুখ থেকে। বলার জন্যে মুখ খুলতে গিয়েও খুলতে পারছে না যেন।
উঠে দাঁড়ালো টম। 'আমি ছিঁড়েছি!'

একসঙ্গে সবক'টা চোখ ঘুরে গেল টমের দিকে।

'আয় এদিকে!' ডাকলেন ডবিনস।

শান্ত পায়ে হেঁটে গেল টম।

হিসিয়ে উঠলো ডবিনসের বেত। কোনদিন এমন মার মারেননি তিনি কাউকে। টুঁ শব্দ করলো না টম। পিঠ পেতে দিয়ে নীরবে সহ্য করে গেল বেতের বাড়ি।

হাঁপিয়ে উঠলেন ডবিনস। মার থামালেন। কিন্তু টমের শাস্তি শেষ হলো না। ছুটির পর দু'ঘণ্টা ক্লাসে আটকে থাকার হুকুম দিয়ে সিটে ফিরে যেতে বললেন টমকে।

টমের দুঃখ নেই। হাসি মুখে সিটে ফিরে এলো সে। জানে, দু'ঘণ্টা শাস্তির পর বেরিয়েই কার সাক্ষাৎ পাবে।

সে-রাতে বিছানায় শুয়েও অনেকক্ষণ ঘুম এলো না টমের চোখে। প্ল্যানের পর প্ল্যান এঁটে যাচ্ছে মনে মনে। কি করে শায়েস্তা করবে আলফ্রেডকে, ভাবছে। কোন প্ল্যানই পছন্দ হচ্ছে না তার। বিকেলে ক্লাস থেকে বেরিয়েই দোরগোড়ায় বেকিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে।

আলফ্রেড টেম্পলের কথা সব বলে দিয়েছে বেকি। বইয়ে কালি ঢেলে দিয়েছে আলফ্রেড। অথচ দেখেও ক্লাসে স্যারকে বলে দেয়নি বলে বার বার মাফ চেয়েছে টমের কাছে।

নির্দ্বিধায় বেকিকে মাফ করে দিয়েছে টম। কিন্তু আলফ্রেডকে ক্ষমা করা যায় না। তাকে শাস্তি পেতেই হবে।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে বেকির একটা কথাই বার বার টমের কানে বাজতে লাগলো: '...ওহ্ টম, তোমার মনটা এতো বড়! এতো বড়...'

উনিশ

...স্কুল ছুটির দিন ঘনিয়ে আসছে।

অন্যান্য বারের মতোই এবারেও ছুটির আগে আরো বেশি নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছেন মিস্টার ডবিনস। পরীক্ষা শেষ। পুরস্কার বিতরণের দিন ঘোষণা করা হয়েছে। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে বেশ কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চান তিনি। তাই নিজেও খাটছেন, ছেলেমেয়েদেরকেও খাটিয়ে মারছেন। পান থেকে চুন খসলেই সপাং করে বেত পড়ছে ছাত্রছাত্রীদের পিঠে। অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে যেন ডবিনসের। মেয়েদের ভেতরে ক্ষোভ, কিন্তু কিছুই করার নেই তাদের। তবে ছেলেরা সহ্য করলো না। কয়েকজনে বসে ফন্দি আঁটলো, এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। কিন্তু কি করে প্রতিশোধ নেয়া যায়? বাতলে দিলো টম।

গাঁয়ে একজন পেইন্টার আছে। তার ছেলে টমের বয়েসী। সে-ও দেখতে

পারে না ডবিনসকে। অন্যান্য ছেলেমেয়ের চেয়ে তার জ্বালা আরো বেশি। তাদের বাড়িতেই লজিং থাকেন ডবিনস। অনেকদিন থেকেই সুযোগ খুঁজছে ছেলেটা। খুশি মনে বন্ধুদের সাহায্য করতে রাজি হয়ে গেল।

নির্দিষ্ট দিন এসে গেল। বিকেল থেকে অনুষ্ঠান। একে একে স্কুলের বিশাল ঘরটায় এসে হাজির হলো গ্রামবাসীরা। এক প্রান্তে একটা মঞ্চ, তাতে ডবিনসের বিশেষ চেয়ার পাতা। রাজকীয় ভঙ্গিতে তাতে বসেছেন মাস্টার সাহেব।

মঞ্চের নিচে তিন সারিতে বেঞ্চ পাতা। দেখতে দেখতে ভরে গেল সব ক'টা বেঞ্চ। একপাশে আলাদা কয়েকটা বেঞ্চে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে ছাত্রছাত্রীরা। ঝলমলে পোশাক পরে এসেছে সবাই। ছাত্রীদের এ-নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই, বরং সাজগোজের বহর দেখাতে পেরে গর্বই বোধ করছে ওরা। কিন্তু ছেলেদের ব্যাপার আলাদা। বেশির ভাগই পোশাকে বাহুল্য সইতে পারছে না, কেবলই উসখুস করছে।

শুরু হলো অনুষ্ঠান। এক এক করে ছেলেমেয়েদের ডাকলেন ডবিনস। এক এক করে মঞ্চে উঠলো গিয়ে ওরা। কেউ আবৃত্তি করে শোনালো, কেউ গল্প শোনালো নিজের ভাষায়, কেউ নিজের লেখা প্রবন্ধ পাঠ করলো। টমকেও যেতে হলো। ছোট্ট একটা কবিতা আবৃত্তি করার কথা বললেন তাকে মাস্টার সাহেব।

জোর গলায় আবৃত্তি শুরু করলো টম। কিন্তু তিনটে লাইনের পরেই আটকে গেল। বাকি লাইনগুলো কিছুতেই মনে করতে পারলো না। দাঁড়িয়ে রইলো মাথা নিচু করে। লজ্জা পাচ্ছে, কিন্তু মনে মনে এক ধরনের আনন্দও অনুভব করছে ও। নিশ্চয় বেতের বাড়ি মারার জন্যে হাত নিশপিশ করছে ডবিনসের, কিন্তু সভায় লোকজনের সামনে পারছেন না। এতে নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে তাঁর।

চাপা গলায় নেমে যাবার আদেশ পেয়ে খুশি মনেই ফিরে এলো টম।

ভূগোলে ছেলেমেয়েদের কতোখানি জ্ঞান আছে অভিভাবকদের সামনে সেটা প্রমাণ করার জন্যে একটা বিশেষ পরীক্ষা নিতে উঠলেন ডবিনস। আসলে, ভূগোলের ওপর তাঁর কতো অগাধ জ্ঞান সেটা দেখিয়ে বাহবা নেবার জন্যেই উঠেছেন তিনি।

পেছনে ঝোলানো ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ডবিনস। চক দিয়ে আমেরিকার ম্যাপ আঁকলেন।

মৃদু হাসি শোনা গেল দর্শকদের মাঝে।

অবাক হয়ে নিজের আঁকা ম্যাপটার দিকে তাকালেন ডবিনস। ধরেই নিলেন, ভালো হয়নি তাই হাসছে লোকেরা। ডাস্টার দিয়ে মুছে ফেলে আরো ভালো করে আঁকলেন। কিন্তু হাসি থামছে না দর্শকদের। আবার আঁকলেন ডবিনস। আগের সব মনোযোগ আর একাগ্রতা দিয়ে। কিন্তু তবু হাসি থামলো না দর্শকদের।

স্কুলবাড়িটা কাঠের তৈরি। একতলা। কিন্তু ডবিনস যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার ওপরে ছোট একটা চিলেকোঠা আছে। কোঠার মেঝেতে গোল একটা ছিদ্র করা হয়েছে, খেয়াল করেননি ডবিনস। সেদিকেই লক্ষ্য আসলে দর্শকদের।

গর্তটা দিয়ে খুব ধীরে নেমে আসছে একটা বিড়াল। গলায় দড়ি বাঁধা, দড়িতে ধরেই ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। শব্দ করতে পারছে না, কম্বলের ফালি দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়েছে মুখ। ছটফট করছে আর হাত-পা ছুঁড়ছে বিড়ালটা।

ম্যাপ আঁকতে ব্যস্ত ডবিনস। লজ্জায় দর্শকদের দিকে ফিরে চাইতে পারছেন না, বিড়ালটার নেমে আসা লক্ষ্য করলেন না।

পরচুলা ব্যবহার করেন তিনি। মাথায় চকচকে টাক, তাই লোকের সামনে কখনো পরচুলাটা খোলেন না তিনি। বাড়িতেও খোলেন না, শুধু গোসলের সময় ছাড়া। ধীরে ধীরে নেমে এসে ডবিনসের ঠিক মাথার ওপর থামলো বিড়াল। ছটফট করছে সমানে। এঁকেবেঁকে নিজেকে দড়ির বাঁধন থেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

হঠাৎ বিড়ালের একটা পা ঠেকে গেল ডবিনসের মাথায়। বাঁকা নখে আটকে গেল পরচুলা। হ্যাঁচকা টানে মাথা থেকে পরচুলাটা খুলে গেল, আটকে থেকে ঝুলতে থাকলো বিড়ালের নখে। দেখা গেল, ডবিনসের চকচকে টাকে রঙের বিচিত্র আঁকিবুঁকি কাটা।

হাসির হুল্লোড় উঠলো দর্শকদের মাঝে। আবার ওপরের গর্ত দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বিড়ালটা, তার নখে আটকে থাকা পরচুলাটাও।

পুরস্কার বিতরণ আর হলো না। সভা ভেঙে দিয়ে বাড়ি চলে গেলেন ডবিনস। হাসতে হাসতে অভিভাবকেরা চলে গেল যার যার বাড়িতে।

মাঠের এক জায়গায় মিলিত হলো কয়েকটা ছেলে। ডবিনসের দুর্দশায় দারুণ খুশি। প্রতিশোধ নেয়া হয়ে গেছে।

দারুণ শিল্পকর্মের জন্যে পেইন্টারের ছেলের প্রশংসা করলো সবাই।

'হ্যাঁ রে, কখন করলি কাজটা?' জিজ্ঞেস করলো টম।

'গত রাতে। ঘুমিয়েছিলো ডবিনস। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলাম। ব্যাটা ঘুমোলে আর হুঁশ থাকে না। পরচুলা সরিয়ে টাকে ছবি আঁকলাম, টেরই পেলো না।'

আবার হাসির হুল্লোড় উঠলো ছেলেদের মাঝে।

অন্ধকারে একটা ছায়া এগিয়ে এলো।

'কে?' জিজ্ঞেস করলো টম।

'লাল পাঞ্জা, জলদস্যু হাকলবেরি ফিন।'

'বিড়ালটা কি করেছিস, হাক?'

'ছেড়ে দিয়েছি।'

'পরচুলাটা?'

'বিড়ালের মাথায় পরিয়ে দিয়েছি।'

হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলো ছেলের দল।

বিশ

ছুটির প্রথম কয়েকটা দিন খুবই খারাপ গেল টমের। অসুখে পড়লো। কয়েকটা দিন বাড়ি থেকেই বেরোতে পারলো না। একটু সুস্থ হতেই আর তাকে আটকে রাখতে পারলেন না পলি খালা।

বেরিয়েই বেকির সঙ্গে দেখা করতে চাইলো টম। ফিরে আসতে হলো ব্যর্থ হয়ে। বাড়ি নেই বেকি। মা-বাবার সঙ্গে বাইরে বেড়াতে গেছে।

মন খারাপ হয়ে গেল টমের। বন্ধুবান্ধবদেরও অনেকেই নেই গাঁয়ে, বেড়াতে গেছে। বিষণ্ন মনে বাড়ি ফিরে এলো সে।

গড়িয়ে গড়িয়ে চললো একেকটা দিন, কাটতেই চায় না। নিরানন্দ ছুটি। হাঁপিয়ে উঠেছে টম। আর পারছে না। এর চেয়ে স্কুল খোলা থাকলেও যেন ভালো ছিলো।

এই সময় হঠাৎ আবার ফিরে এলো উত্তেজনা। বিচার শুরু হলো মাফ পটারের। বিচার আর কি? সাক্ষীর দরকার নেই তেমন। প্রমাণ যা আছে, সব পটারের বিরুদ্ধে। তাছাড়া নিজেই দোষ স্বীকার করেছে আসামী। গাঁয়ের লোকে বলাবলি করছে, এবার ঠিক ফাঁসি হয়ে যাবে পটারের।

টমের মন আরো খারাপ হয়ে গেল। এই সময় হাকটাও নেই। কোথায় গেছে, কে জানে! ও থাকলেও আলাপ-পরামর্শ করে একটা কিছু করা যেতো। পটারের ফাঁসি হয়ে যাক, কিছুতেই চায় না টম।

পটারের বিচার শেষ হবে আগামী দিন, ঠিক এই সময় এসে হাজির হলো হাক। পথে দেখা হয়ে গেল টমের সঙ্গে। দুজনেই দুজনকে দেখে হৈ-হৈ করে উঠলো। একথা ওকথার পর জিজ্ঞেস করলো টম, 'হাক, ওই ব্যাপারে কাউকে কিছু বলেছিস?'

'কোন্ ব্যাপারে?'

'মাফ পটার?'

'না তো! কেন?'

'আগামী কাল হয়তো ফাঁসি হয়ে যাবে পটারের। ওর জন্যে আমাদের কিছু করা দরকার, হাক। নিরপরাধ লোকটার ফাঁসি হয়ে যাবে, আমরা কিছুই বলবো না, এটা মেনে নিতে পারছি না।'

'আমিও না।'

'তাছাড়া পটার খুব একটা খারাপ লোক না। মাতাল হয়ে থাকে, মস্তানী করে বেড়ায়, এটা আর এমন কি খারাপ?'

'আসলে এ গাঁয়ের অনেক ভালো লোকের চেয়ে ভালো সে। আমাকে দেখলেই দূর দূর করে তাড়ায় লোকে। অথচ পটার অনেক সময় খেতে দিয়েছে। একবারে আদ্দেকটা মাছ দিয়ে ফেলেছিলো একবার। শুধু তাই না।

খাবার চাইলে কখনো ফেরায়নি সে আমাকে। নিজের ভাগ থেকেই দিয়ে ফেলে অনেক সময় আধা উপোস করে কাটিয়েছে।'

'আমাকেও অনেক সাহায্য করেছে সে। ঘুড়ি বানিয়ে দিয়েছে। বড়শিতে সুতো বেঁধে দিয়েছে। ও জেল থেকে বেরিয়ে আসুক, এটাই আমি চাই।'

'আমিও। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো ওকে বের করে আনতে পারবো না।'

'পারবো!' দৃঢ় গলায় বললো টম, 'আমরাই পারবো।'

'তাহলে চল চেষ্টা করে দেখি?'

'হ্যাঁ। চেষ্টা করবো।'

সেইন্ট পিটার্সবার্গের ছোট্ট আদালতে তিল ধারণের জায়গা নেই।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে মাফ পটার। দর্শকদের সিট খালি নেই একটাও। গম্ভীর মুখে বসে আছেন বিচারক। জুরিদের রায় পেলেই রায় ঘোষণা করবেন।

গম্ভীর মুখে কি যেন লিখছিলো একজন উকিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। 'ইয়োর অনার, আমার কিছু কথা আছে।'

অনুমতি দিলেন বিচারক।

দর্শকদের দিকে ফিরলো উকিল। ডাকলো, 'টমাস সয়্যার, এসো এদিকে।'

অবাক হয়ে গেল ঘরের সবাই, এমনকি মাফ পটার পর্যন্ত। একসঙ্গে সবক'টা মুখ ঘুরে গেল টমের দিকে।

উঠে দাঁড়িয়েছে টম। কাঁপা কাঁপা পায়ে এসে উঠলো সাক্ষীর কাঠগড়ায়। মুখ শুকনো। ভয় পাচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে।

'হলপ' করানো হলো টমকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো উকিল, 'টমাস সয়্যার, সতেরোই জুন মাঝরাতে কোথায় ছিলে তুমি?'

ইনজুন জো-র কঠিন হয়ে ওঠা চেহারার দিকে চাইলো টম। শুকিয়ে গেল জিভ গলা। স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। বার কয়েক ঢোক গিলে নিয়ে বলে ফেললো টম, 'কবরখানায়।'

'আরেকটু জোরে, প্লীজ। ভয়ের কিছু নেই। কোথায়?'

'কবরখানায়।'

ইনজুন জো-র ঠোঁটে হাসির একটা ঝিলিক ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, দেখতে পেলো টম।

'হস উইলিয়ামসের কবরের কাছাকাছি ছিলে?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'জোরে, জোরে, বলো। কতো কাছে ছিলে?'

'আপনি এখন আমার যতো কাছে, ততোখানি।'

'লুকিয়ে ছিলে নিশ্চয়?'

'ছিলাম।'

'কোথায়?'

'কবরের ধারে তিনটে দেবদারু গাছ আছে। একটার আড়ালে।'

ইনজুন জো-কে চমকে উঠতে দেখলো টম।

'তোমার সঙ্গে আর কেউ ছিলো?'

'হ্যাঁ, স্যার। আমার সঙ্গে গিয়েছিলো...'

'দাঁড়াও দাঁড়াও। তোমার সঙ্গীর নাম বলার দরকার নেই। দরকার হলে পরে হাজির করা যাবে ওকে। আগে বলো, সঙ্গে কি ছিলো তোমার?'

দ্বিধা করতে লাগলো টম।

'বলো, খোকা, বলে ফেলো। চুপ করে থেকো না। সত্যি কথা বলতে লজ্জা নেই, যতোই হাস্যকর হোক না। সঙ্গে কি নিয়ে গিয়েছিলে?'

'একটা...একটা মড়া বিড়াল।'

মৃদু হাসির ঢেউ উঠলো, থামিয়ে দিলেন বিচারক।

'বিড়ালটার কঙ্কাল আদালতে হাজির করা যাবে। আচ্ছা, খোকা, এবার বলো তো কি কি ঘটেছিলো সে-রাতে? কি কি দেখেছো? কিছুই গোপন করবে না। ভয় পাবারও কিছু নেই।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো টম। ইনজুন জো-র দিকে তাকালো আবার। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা শুরু করলো। সব বলে গেল এক এক করে। স্তব্ধ হয়ে শুনছে সবাই। বলে চলেছে টম, '...কফিনের ডালাটা তুলে নিলো ডাক্তার। মাফ পটারের মাথায় বাড়ি মারলো। ছুরি হাতে লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে এলো ইনজুন জো...'

জানালার কাচ ভাঙার তীব্র ঝনঝন শব্দে থেমে গেল টম। চমকে ফিরে তাকালো সবাই। জানালার বাইরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ইনজুন জো।

পালালো খুনেটা।

আরেকবার হীরো হয়ে উঠলো টম। বয়স্কদের স্নেহের পাত্র, সমবয়েসীদের শ্রদ্ধার। সেইন্ট পিটার্সবার্গের খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হলো খবরটা। রাতে নাম উঠলো টমের। সমবয়েসীরা ধরেই নিলো, প্রেসিডেন্ট হতে আর বেশি বাকি নেই তার।

কিন্তু টমের মনে শান্তি নেই। সাঁঝের আগেই ঘরে গিয়ে সেধোয় সে। সারাটা রাতই কাঁপে আতঙ্কে। দুঃস্বপ্ন দেখে বার বার ভেঙে যায় ঘুম। জানালা-দরজায় কোন শব্দ হলেই চমকে ওঠে, এই বুঝি তাকে খুন করতে এলো ইনজুন জো।

নিজের সব ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন শেরিফ, কিন্তু ইনজুন জো-র টিকির সন্ধানও মিললো না। বাতাসে মিশে গেছে যেন খুনেটা।

সেইন্ট লুই থেকে একজন ডিটেকটিভও আনানো হলো। গম্ভীর মুখে ভারিক্কি চালে অনুসন্ধান শুরু করলো সে। কিন্তু ইনজুন জো-র হদিস মিললো না। ব্যর্থ হয়ে আবার গম্ভীর মুখেই ফিরে গেল ডিটেকটিভ।

ধরেই নেয়া হলো, ইনজুন জো নেই সেইন্ট পিটার্সবার্গে। দূরে কোথাও সরে পড়েছে।

দিন যায়। ধীরে ধীরে ভয় অনেক কমে এলো টম আর হাকের। আবার হাসি খেলায় মেতে উঠতে শুরু করেছে ওরা।

'চল, গুপ্তধন খুঁজি আমরা,' হঠাৎ একদিন প্রস্তাব করে বসলো টম।

'গুপ্তধন!' অবাক হলো হাক। 'কোথায় খুঁজবো?'

'যে কোন জায়গা থেকে শুরু করলেই হলো।'

'সবখানেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে নাকি?'

'না, তা না। কিছু বিশেষ জায়গা আছে গুপ্তধন লুকানোর। যেমন ধর, কোন নির্জন দ্বীপ, কিংবা মরে যাওয়া গাছের গুঁড়ির তলায়। পোড়ো বাড়ির মেঝের নিচেও থাকতে পারে।'

'কারা লুকোয় ?'

'তা-ও জানিস না? ডাকাতেরা। নাকি সানডে স্কুলের সুপারিনটেনডেন্টরা লুকোয় বলে ভাবছিস ?'

'কি জানি! তবে আমি হলে লুকাতাম না। খরচ করে ফেলতাম দু'হাতে।'

'আমিও। কিন্তু ডাকাতেরা তা করে না। ওরা লুকিয়ে রেখে সে-জায়গা ছেড়ে চলে যায়।'

'তুলে নিতে আর ফিরে আসে না ?'

'না। হয়তো ভুলেই যায়, কিংবা সময় করে নেয়ার আগেই যায় মরে। যা-ই হোক, ওরা আর আসে না। অনেক অনেক বছর লুকানো থাকে গুপ্তধনগুলো। হঠাৎ অন্য কেউ একটা হলদেটে কাগজ পেয়ে যায়, ওতে লেখা থাকে কোথায় লুকানো আছে গুপ্তধন। সাংকেতিক ভাষায়।'

'এমন কিছু পেয়েছিস নাকি?'

'না।'

'তাহলে কোথায় আছে কি করে জানবি?'

'জানার দরকার নেই। ওরা কোথায় কোথায় লুকিয়ে রাখে এটা তো জানি। জ্যাকসনস আইল্যাণ্ডে ভালোমতো খোঁজ করে দেখতে পারি, পোড়ো বাড়ি স্টিল হাউসে খোঁজা যায়, বনেও অনেক পুরোনো গাছের গুঁড়ি আছে। ওগুলোর কোন একটার তলায়ও থাকতে পারে গুপ্তধন।'

'সবক'টা জায়গায়ই আছে ?'

'আরে না! কিচ্ছু বুঝিস না!'

'জানবি কি করে কোন্‌টার তলায় আছে ?'

'এক এক করে খুঁড়ে যাবো সব জায়গা।'

'কি বলছিস? সারাটা গ্রীষ্মকালই লেগে যাবে!'

'তাতে কি? ধর কোন তামার কলসে শ'খানেক ডলার পেয়ে গেলি, কিংবা এক সিন্দুক হীরা। কষ্টটা কি কষ্ট মনে হবে আর?'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল হাকের। 'এ-ক-শো ডলার! এক সিন্দুক হীরার

দরকার নেই আমার। একশো ডলার হলেই বেশি খুশি।'

'দূর গাধা! এক সিন্দুক হীরার দাম একশো ডলারের চেয়ে অনেক বেশি।'

'তাহলে কোত্থেকে খোঁড়া শুরু করছিস?'

'পাহাড়ের ওপারেই চল আগে যাই। অনেক পুরোনো গাছের গুঁড়ি আছে। স্টল হাউসটাও কাছাকাছিই। কি বলিস?'

'রাজি।'

পুরোনো ভাঙা একটা গাঁইতি আর কোদাল জোগাড় করে গুপ্তধন খুঁজতে চললো ওরা। মাইল তিনেক পাহাড়ী পথ পেরিয়ে এসে হাঁপিয়ে পড়লো। একটা দেবদারুর ছায়ায় বসলো জিরিয়ে নিতে।

পাইপ ধরালো হাক। 'জায়গাটা খুব ভালো লাগছে আমার।'

'আমারও। আচ্ছা হাক, গুপ্তধন পেলে তোর ভাগ দিয়ে কি করবি?'

'খালি পাই খাবো, আর সোডা। রোজ। আর যে ক'টা সার্কাস আসবে সেইন্ট পিটার্সবার্গে, সব দেখতে যাবো। দারুণ মজা হবে!'

'কিছু জমিয়ে রাখবি না?'

'জমিয়ে রাখবো! কেন?'

'ভবিষ্যতে চলার জন্যে।'

'লাভ হবে না। যে কোনদিন গাঁয়ে ফিরে আসতে পারে বাবা। সব ছিনিয়ে নেবে আমার কাছ থেকে। তার আগেই খরচ করে ফেলবো আমি। তোর ভাগ দিয়ে কি করবি?'

'নতুন একটা ড্রাম কিনবো। ভালো দেখে তলোয়ার কিনবো একটা, একটা লাল নেকটাই কিনবো, আর বাচ্চা দেখে একটা ষাঁড়। বাকি টাকা দিয়ে বিয়ে করবো।'

'বিয়ে!'

'হ্যাঁ।'

'তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, টম! আবোল-তাবোল বকছিস!'

'দেখিস করি কি-না।'

'করলে গাধামো করবি। আমার বাপ-মাকে তো দেখেছি। খালি ঝগড়া করতো, সারাদিনই। মারামারিও করতো।'

'ওরা করতো। কিন্তু আমি যাকে বিয়ে করবো, সে করবে না।'

'আমার কি মনে হয় টম, মেয়েমানুষগুলো সব এক। একটাও ভালো না। কাজটা করার আগে ভালো করে ভেবে দেখিস। তা মেয়েটা কে?'

'পরে বলবো।'

'টম, তুই বিয়ে করে ফেললে আমি আরো একা হয়ে যাবো!'

'না, হবি না। আমাদের সঙ্গে বাস করবি তখন। চল, কাজ শুরু করে দিই।

আধঘণ্টা একটানা খুঁড়ে গেল ওরা। কিছুই পাওয়া গেল না। আরো আধঘণ্টা খুঁড়লো। থামোকা। হাক বললো, 'এরচে গভীরে রাখে ওরা?'

'রাখে, তবে সব সময় না। মনে হয় ভুল জায়গায় খুঁড়ছি আমরা।'

আরেকটা নুতন জায়গা খুঁজে বের করলো ওরা। আবার খুঁড়তে লাগলো।

খুঁড়েই চললো, খুঁড়েই চললো। শেষে কোদালের বাঁটের ডগায় ভর দিয়ে এক হাতে কপালের ঘাম মুছলো হাক। বললো, 'এখানেও নেই। এরপর কোথায়?'

আঙুল তুলে পাহাড়ের একদিকে দেখিয়ে বললো টম, 'ওদিকে। অনেক গুঁড়ি আছে। পুরোনো।'

'কিন্তু ও-জায়গাটা তো উইডো ডগলাসের সম্পত্তি। আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে না গুপ্তধন?'

'গুপ্তধন যে পায় তারই। থাক না সেটা অন্যের সম্পত্তিতে।'

আর কিছু বললো না হাক। এগিয়ে গিয়ে আবার কাজে লাগলো দুজনে। খানিকক্ষণ খুঁড়ে বললো হাক, 'আবার ভুল জায়গা খুঁড়ছি। কি মনে হয় তোর?'

'অবাকই লাগছে, হাক! বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে ডাইনিরা অবশ্য বাদ সাধে। তেমন কিছুই ঘটছে হয়তো আমাদের বেলায়।'

'দূর। দিনের বেলা কোনো ক্ষমতা থাকে না ডাইনিদের।'

'তাই তো! ভাবিনি। আরে...এইবার মনে পড়েছে। যেখানে সেখানে খুঁজে কোন লাভ নেই। মাঝরাতে গুঁড়ির ছায়া যেখানে পড়বে খুঁড়তে হবে সেখানে।'

'তার মানে অযথাই খাটলাম এতোক্ষণ। তাহলে চল ফিরে যাই, রাতে আসবো। বেরোতে পারবি তো?'

'পারতেই হবে। দেরি করলে গর্তগুলো লোকের চোখে পড়ে যাবে। বুঝে যাবে ওরা কেন খোঁড়া হয়েছে।'

'ঠিক আছে। রাতে বিড়ালের ডাক ডাকবো। শুনলেই বেরিয়ে আসবি।'

'ঠিক আছে। আয়, গাঁইতি আর কোদাল, কোনো একটা ঝোপে লুকিয়ে রাখি।'

রাতের বেলা ফিরে এলো আবার দুই কিশোর। মাঝরাতের দেরি আছে। অপেক্ষার পালা। গড়িয়ে গড়িয়ে চললো সময়। বাতাস বইতে লাগলো। গাছের পাতায় পাতায় মর্মর তুললো যেন ভূতের নিঃশ্বাস, গাছের তলায় নেচে উঠলো অন্ধকার ছায়া। দূরে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো একটা কুকুর। মাথার ওপরে গাছের ডালে কলজে কাঁপানো ডাক ডেকে উঠলো পেঁচা।

শিউরে উঠলো ছেলে দুটো। গলার স্বর খাদে নেমে গেল ওদের। মাঝরাত এসে গেছে। জেগে উঠেছে ভূতেরা। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এলো ওরা।

আবার প্রহর ঘোষণা করলো একটা পেঁচা। মাঝরাত, অনুমান করে নিলো ছেলেরা। ক্ষয়া চাঁদের হলদে আলোয় মাটিতে ছায়া পড়েছে গাছের গুঁড়ির। সরে আসছে ছায়াটা ক্রমেই। ছোট হতে ছোট হচ্ছে। দূরে আরেকটা পেঁচা ডেকে উঠতেই উঠলো টম। 'চল, সময় হয়েছে।'

খুঁড়ে চললো ওরা। হঠাৎ কিসে যেন ঠন্‌ন্‌ করে বাড়ি খেলো গাঁইতি। কিন্তু কিসে বাড়ি খেয়েছে আবিষ্কার করেই চুপসে গেল। পাথর। হতাশ গলায় বললো হাক, 'দূর, হবে না। এটাও ভুল জায়গা!'

'তার মানে সময়ের অনুমান ঠিক হয়নি। হয় বারোটার আগেই ছায়ায় খুঁড়ছি, কিংবা পরের।'

হাত থেকে কোদালটা ফেলে দিলো হাক। 'তাই হবে। চল, বাদই দিই

এসব। কিছুতেই ঠিক করতে পারবো না ঠিক সময়। কি জায়গা! মাঝরাত। ভূতপ্রেতগুলো সব জেগে উঠেছে। কেবলই মনে হচ্ছে আমাকে ঘিরে আছে ওরা। ভয়ে পেছনে তাকাতে পারছি না, সামনেরগুলো যদি এসে চেপে ধরে! গা শিরশির করছে! এভাবে কাজ করা যায়?'

'আমারও এমন লাগছে! শুনেছি, গুপ্তধনের সঙ্গে পাহারা দেবার জন্যে একজন মানুষকে মেরে রেখে যায় ডাকাতেরা!'

'ঈ-শ্ব-র!'

'হ্যাঁ, তাই করে ওরা! ওই মরা লোকটার ভূতও হতে পারে! কাছাকাছিই আছে হয়তো!'

'টম, এসব জায়গায় আমি নেই আর! যে কোনো সময় ধরে ঘাড় মটকাতে পারে!'

'ওদেরকে আমিও খোঁচাতে চাই না। কে জানে, আরেকটু খুঁড়লেই হয়তো বেরিয়ে আসবে খুলিটা! কথা বলে উঠবে!'

'ওরেব্বাপরে! টম, চল পালাই! অন্য কোথাও চেষ্টা করে দেখবো না হয়!'

'তাই চল।'

'এবারে কোথায়?'

ভেবে নিলো টম। বললো, 'পোড়ো বাড়িটায়। কি বলিস ?'

'সেটাও তো ভূতের আড্ডা! ওসব পোড়ো বাড়ি আমার একদম পছন্দ না, টম। ওসব ভূত আরো হারামি! প্রেতাত্মা, মরার কঙ্কালগুলো জ্যান্ত হয়ে ওঠে। পেছন থেকে এসে চমকে দেয়। দাঁত কিড়মিড় করে। ভিড়মি খেয়েই মরে যায় কতো লোক!'

'ঠিক, কিন্তু সেটা রাতের বেলা। দিনের বেলা বেরোতে পারে না ভূতেরা। দিনে খুঁজবো আমরা।'

'কিন্তু দিনের বেলায়ও ওই বাড়িটাতে যেতে চায় না লোকে, ভয় পায়। জানিস ভালো করেই।'

'আসলে, কোথাও মানুষ খুন হলেই সে-জায়গাটাতে যেতে চায় না লোকে। দিনের বেলায় কখনো ভূত দেখা যায়নি বাড়িটাতে। রাতেও দেখা যায়নি, মাঝে মাঝে জানালায় অবশ্য নীল আলো দেখা যায়। সেটা ভূতের আলো হতে পারে, তবে ভূত না।'

'আলো থাকলে ভূত থাকতেই হবে, নইলে ভূতের আলো হলো কি করে? নিশ্চয় কাছাকাছিই কোথাও থাকে ওরা। আর নীল আলো ভূতেরা ছাড়া মানুষে জ্বালাতে পারে না।'

'তা ঠিক। কিন্তু ওই আলো দিনের বেলা কখনো দেখা যায় না যখন দিনে ওখানে ঢুকতে ভয় কি?'

'তুই যা ভালো বুঝিস। বললে ঢুকবো তোর সঙ্গে, কিন্তু ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়।'

বাড়ির দিকে রওনা হয়ে পড়লো দুজনে। পাহাড়ের মাথায় চড়ে দাঁড়ালো। তাকালো নিচের উপত্যকার দিকে। ভূতুড়ে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কেমন

যেন রহস্যময় লাগছে সবকিছু। উপত্যকার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। একেবারে নিঃসঙ্গ, আশপাশে আর কোনো বাড়িঘরও নেই। সীমানার চারধারে বেড়া ছিলো এককালে, এখন আর তার চিহ্নও নেই। ঘন হয়ে জন্মে বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে ঠেকেছে বড় বড় ঘাস, আগাছা। বেঁকেচুরে দুমড়ে আছে চিমনির মাথা। জানালার শার্সির কাঠামোই শুধু আছে, একটা কাচও নেই। কাঠের ছাতের একটা কোণ ধসে গেছে।

তীক্ষ্ণ চোখে বাড়িটার দিকে তাকালো দুই কিশোর। জানালায় নীল আলো খুঁজলো। নেই।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও আলো দেখতে পেলো না ওরা। আবার চলতে শুরু করলো। নামতে লাগলো পাহাড় বেয়ে। বাড়িটার সঙ্গে অনেক ফারাক রেখে ঘুরপথে ঘন বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললো।

বাইশ

পরদিন দুপুরে আবার মরা গাছের গুঁড়িটার কাছে এসে হাজির হলো টম আর হাক। গতরাতে গাঁইতি-কোদাল ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রেখে গেছে। ওগুলো বের করে নিয়ে পোড়ো বাড়িটার দিকে এগোলো দুজনে। চলতে চলতে হঠাৎ বলে উঠলো হাক, 'টম, আজ কি বার মনে আছে?'

থমকে দাঁড়ালো টম। 'হাক, ইস্‌স্‌, এক্কেবারে মনে ছিলো না!'

'আমারও না। হঠাৎই মনে পড়লো আজ শুক্রবার।'

'ভালোই হয়েছে। নইলে গিয়ে পড়তাম ভূতের খপ্পরে।'

'অন্যদিন যাবো। কিন্তু শুক্রবারে মোটেই না।'

'তাছাড়া গতরাতে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। ইঁদুর দেখেছি স্বপ্নে।'

'সর্বনাশ! ওরা কি মারামারি করছিলো?'

'না।'

'তাহলে ঠিক আছে। বিপদ হতে পারে, তবে তেমন মারাত্মক না। হুঁশিয়ার থাকতে হবে আর কি। তাহলে আজ পোড়ো বাড়িতে যাওয়া বাদ। চল রবিন্‌ হুড রবিন হুড খেলি।'

সারাটা বিকেল রবিন হুড খেলে কাটালো ওরা। পশ্চিম আকাশে এক সময় ঢলে পড়লো সূর্য। কাছেই পোড়ো বাড়ি। শুক্রবারের এই ভীষণ খারাপ দিনে আর অপেক্ষা করতে চাইলো না ওরা। ইতিমধ্যেই দীর্ঘ হয়ে উঠেছে গাছের ছায়া। আর খানিক পরেই টুপ করে ডুবে যাবে সূর্য, নেমে আসবে অন্ধকার। বাড়ি ফিরে চললো দুই কিশোর।

পরদিন শনিবার, দুপুরের পর আবার সেই জায়গাটায় এসে পৌঁছুলো ওরা। কোদাল আর গাঁইতিটা বের করে নিয়ে এগিয়ে চললো পোড়ো বাড়ির দিকে।

বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা। বিকেলের রোদে কেমন যেন

অদ্ভুত দেখাচ্ছে বাড়িটাকে। কেমন এক ধরনের গা-ছমছমে নীরবতা।

সব শঙ্কা আর ভয় ঝেড়ে ফেলে সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো দুই কিশোর। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুললো টম। পা রাখলো ভেতরে। পেছনে ঢুকলো হাক।

মেঝে আর দেখা যায় না এখন, ঘাস জমে ঢেকে গেছে। চুন-বালি সব খসে পড়েছে দেয়ালের। প্রাচীন ফায়ারপ্লেসটা হাঁ করে আছে এদিকে। ভাঙা জানালা। পুরোনো কাঠের সিঁড়ির জায়গায় জায়গায় তক্তা খসে গেছে। যা অবশিষ্ট আছে, ছোঁয়া লাগলেই যেন ঝরে পড়বে। যেখানে সেখানে মাকড়সার ঘন জাল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজনে। সন্দেহজনক সামান্যতম শব্দ হলেই ঘুরে পালাবে।

শব্দ হলো না। জোর করে ভয় দমন করে সারা ঘরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো টম। কোথায় গুপ্তধন থাকতে পারে, মনে মনে বুঝে নেবার চেষ্টা করলো। নাহ্, এখানে নেই মনে হচ্ছে! দোতলায় দেখতে হবে।

কোদাল আর গাঁইতিটা ঘরের এক কোণে ফেলে রেখে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল দুজনে।

ওপরের অবস্থাও নিচের মতোই। ধুলোবালি-ময়লা আর মাকড়সার জাল। এক কোণে একটা বড়সড় আলমারি দাঁড়িয়ে আছে, তবে অবস্থা দেখেই বোঝা যায় আর বেশিদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। ওটাতে থাকতে পারে কিছু। এগিয়ে গিয়ে খুলে দেখলো ওরা। না, কিচ্ছু নেই।

খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলো ওরা। পেলো না কিছুই। আবার নিচে নেমে আসার জন্যে পা বাড়ালো। বাড়িয়েই থেমে গেল, 'স্-স্!'

'কি হলো?' টমের কাঁধের কাছে ফিসফিস করলো হাক।

'আস্তে! শুনছিস না!'

'কি?...ও হ্যাঁ! চল পালাই!'

'চুপ! একদম নড়বি না! দরজার কাছে এসে গেছে ওরা!'

পিছিয়ে এসে উপুড় হয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়লো দুজনে। ভয়ে দুরুদুরু করছে বুকের ভেতর। কাঠের মেঝের জায়গায় জায়গায় ফাঁক। এমনি একটা ফাঁকে চোখ রেখে চাইলো নিচের দিকে।

'থেমে গেছে ওরা...না না, আসছে...ওই যে এসে গেছে! ফিসফিসও করবি না, হাক! ইস্স্, কেন যে এলাম মরতে!'

দুজন লোক ঢুকলো নিচের তলায়। আরে ব্যাটা দেখছি সেই বোবা-কালা স্প্যানিয়ার্ডটা!–ভাবছে দুই কিশোর। সেইন্ট পিটার্সবার্গে দেখা যায় ইদানীং। কিন্তু সঙ্গের লোকটা কে? চেহারা তো একেবারে ডাকাতের মতো!

কর্কশ চেহারা স্প্যানিয়ার্ডের। মাথায় ঝাঁকড়া সাদা চুল কাঁধের ওপর নেমে এসেছে। পাকানো লম্বা সাদা গোঁফ। চোখে সবুজ চশমা। এগিয়ে গিয়ে বসে পড়লো দেয়ালে হেলান দিয়ে। পাশেই বসলো তার সঙ্গী।

কি যেন কথা বলছিলো ওরা ঘরে ঢোকার আগে। সেই কথার খেই ধরলো স্প্যানিয়ার্ডের সঙ্গী। 'না, আমার ভালো লাগছে না। আগাগোড়া ভেবে দেখলাম। সাংঘাতিক বিপজ্জনক!'

'বিপজ্জনক!' ছেলে দুটোকে অবাক করে দিয়ে কথা বলে উঠলো বোবা-কালা লোকটা। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলো। 'এক্কেবারে কচিখোকা!'

আঁতকে উঠলো দুই কিশোর। ইনজুন জো-র গলা!

খানিক নীরবতা। তারপর বললো জো, 'এরচে বিপজ্জনক কাজ তো করেছিস। আর করেছিসও খামোকা। কিচ্ছু পাসনি।'

'ওটার কথা আলাদা। নদীর ধারে নির্জন জায়গা। আশপাশে আর কোন বাড়িঘর ছিলো না। আমরা যে চেষ্টা করেছি, এটাই জানবে না কেউ।'

'এখানে যে আসি, এটা তো আরো বিপজ্জনক। লোকে ঢুকতে দেখলেই সন্দেহ করবে।'

'জানি। কিন্তু ওই বোকামিটা করার পরে লুকানোর এরচে ভালো জায়গা আর খুঁজেও পাচ্ছি না। এখানে থাকারও একদম ইচ্ছে নেই আমার। পরশুই চলে যেতাম। পারছি না ওই হতচ্ছাড়া ছেলে দুটোর জন্যে। কদিন ধরেই পাহাড়ের গোড়ায় খেলতে আসছে।'

নিজেদের ব্যাপারে আলোচনা শুনে চমকে উঠলো টম আর হাক।

খাবার বের করলো লোক দুটো। নীরবে খাওয়া সারলো। তারপর বললো জো, 'নদীর উজানেই চলে যাস তুই, তোর জায়গায়। অপেক্ষা করিস আমার জন্যে। সেইন্ট পিটার্সবার্গে আরো দুয়েকবার যেতে হবে আমাকে, খোঁজখবর করতে হবে। তারপর ডাকবো তোকে। দুজনে মিলে শেষ করবো কাজটা। তারপর টেক্সাসে পালিয়ে যাবো আমরা।'

রাজি হলো অন্য লোকটা।

দুজনেই হাই তুলছে বার বার। জো বললো, 'সাংঘাতিক ঘুম পেয়েছে! এবার পাহারা দেয়ার পালা তোর।' বলে আগাছার ওপরই শুয়ে পড়লো সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাক ডাকতে শুরু করলো। বার দুই তার গায়ে ঠেলা দিলো অন্য লোকটা। সাড়া না পেয়ে আরাম করে হেলান দিয়ে বসলো। শিগগিরই ঢুলতে শুরু করলো সে। দুজন লোকের নাক ডাকার শব্দে ভরে উঠলো নিস্তব্ধ ঘর।

হাকের কানের কাছে ফিসফিস করলো টম, 'এই সুযোগ! আয় ভাগি!'

'আমি পারবো না। ব্যাটারা জেগে গেলে খুন করে ফেলবে!'

বার দুয়েক হাককে চাপাচাপি করলো টম। রাজি হলো না হাক। শেষে নিজেই উঠে এগিয়ে গেল সিঁড়ির কাছে। প্রথম ধাপে পা রাখতেই মড়মড় করে উঠলো পুরোনো নড়বড়ে সিঁড়ি। চমকে উঠলো হাক। তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এলো নিজের জায়গায়। আর নেমে যাবার চেষ্টা করলো না।

সময় যেন আর কাটতেই চাইছে না। বাইরে ধূসর হয়ে আসছে আলো। সূর্য ডুবে গেছে। আর খানিক পরেই নামবে অন্ধকার।

একজনের নাক ডাকা থেমে গেল। উঠে বসলো ইনজুন জো। ঢুলন্ত সঙ্গীর গায়ে ধাক্কা লাগালো। 'এই বুঝি তোর পাহারা দেয়া? কপাল ভালো, ঘটেনি কিছুই।'

'আরে, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?'

'না না ঘুমাসনি, এই একটু চোখ বুজে ছিলি আর কি। এখন কাজের ক

বল। মালামালগুলো নিয়ে কি করি!'

'এখানেই ফেলে যাবো নাকি বুঝতে পারছি না! উত্তরে রওনা হবার আগে এসে নিলেও তো পারি। সাড়ে ছ'হাজার রূপার ওজন কম না।'

'ঠিক আছে। আসা যাবে আরেকবার। কিন্তু খোলা জায়গায় ফেলে যাওয়াটা উচিত হবে না। লুকিয়ে রেখে যেতে হবে।'

'ঠিক,' বলে উঠে গেল ডাকাতে চেহারার লোকটা। ঘরের এক কোণে একটা পাথরের আড়াল থেকে একটা চটের থলে বের করে আনলো। ঝনঝন করে শব্দ উঠলো থলের ভেতর থেকে। নিজে এসে বসলো ইনজুন জো-র পাশে।

ছুরি দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করলো ইনজুন জো।

বিপদের কথা ভুলে গেছে ছেলে দুটো। ফাঁক দিয়ে চেয়ে আছে দুই ডাকাতের দিকে। কৌতূহল ফেটে পড়ছে যেন। সাড়ে ছ'হাজার রৌপ্যমুদ্রা! গুপ্তধন খোঁজা সার্থক হয়েছে।

কিসের সঙ্গে খোঁচা লাগলো জো-র ছুরির। 'আরে!'

'কি?' জানতে চাইলো জো-র সঙ্গী।

'পচা কাঠ! বাক্সটাক্স কিছু হবে! আয় তো, হাত লাগা। দেখি কি ওটা!'

ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে বাক্সের পচা ডালায় একটা গর্ত করে ফেললো ওরা সহজেই। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে মুঠো করে কিছু তুলে আনলো জো। 'আরে! সোনা! সোনার মোহর!'

কনুই দিয়ে হাকের গায়ে গুঁতো মারলো টম।

'কতবড় বাক্স, দেখতে হচ্ছে!' বললো জো-র সঙ্গী। 'ফায়ারপ্লেসের কাছে একটা ভাঙা গাঁইতি আর কোদাল পড়ে আছে। দাঁড়া, নিয়ে আসি।'

প্রায় ছুটে গিয়ে গাঁইতি আর কোদালটা নিয়ে এলো সে।

হাত বাড়িয়ে গাঁইতিটা নিলো জো। ওটার দিকে চেয়ে মাথা নাড়লো। বিড়বিড় করে বললো কি যেন! তারপর কোপ বসালো মাটিতে।

শিগগিরই বাক্সটা তুলে আনলো দুজনে। বেশি বড় না। লোহার পাতে মোড়া বাক্স, এককালে খুবই শক্ত ছিলো, এখন কাঠ পচে নষ্ট হয়ে গেছে। এক টানে ডালা তুলে ফেললো জো। অবাক হয়ে চেয়ে রইলো দুজনে।

'পার্ড, কয়েক হাজার ডলারের সোনা এখানে!' বলে উঠলো ইনজুন জো।

'শুনেছি, এক গ্রীষ্মে ডাকাত মুরিয়েলের দল আড্ডা গেড়েছিলো এই বাড়িতে।'

'হ্যাঁ।'

'এখন আর ওই কাজটা করার দরকার নেই আমাদের, কি বলিস?'

'আমাকে চিনিস না তুই, পার্ড। শুধু ডাকাতি না, প্রতিশোধের ব্যাপারও আছে তাতে। প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে আমার বুকে। তুই সাহায্য করছিস আমাকে। তারপর যাবো টেক্সাসে। এখন বাড়ি চলে যা, তোর ন্যান্সি আর ছেলেমেয়ের কাছে। সময়মতো গিয়ে ডেকে আনবো।'

'ঠিক আছে, বলছিস যখন। তো এখন এগুলো কি করবো? আবার মাটিতে পুতে রেখে যাবো?'

'হ্যাঁ। ...না না, দাঁড়া। ভুলেই গিয়েছিলাম! গাঁইতির ফলায় মাটি লেগে ছিলো! খানিক আগে ওটা দিয়ে মাটি খুঁড়েছিলো আর কেউ। তাছাড়া একটা গাঁইতি আর কোদাল হঠাৎ ফায়ারপ্লেসের কাছে এলো কি করে? কে এনেছে? কোথায় গেল সে? কারো শব্দ শুনেছিস? দেখেছিস কাউকে?'

বিমূঢ় হয়ে গেছে যেন জো-র সঙ্গী। এদিক ওদিক মাথা নাড়লো।

ওপরে স্তব্ধ হয়ে গেছে দুই কিশোর। হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে। আতঙ্কে কাঁপছে থরথর করে।

'তার মানে এখানে যাতায়াত আছে আর কারো,' আবার বললো ইনজুন জো। 'এখানে বাক্স রাখা চলবে না আর। আমার ডেরায় নিয়ে যাবো।'

'কোথায়? এক নম্বরে?'

'না! তেমন গোপন জায়গা না ওটা। দু'নম্বরে নিয়ে যাবো, ক্রসের নিচে।'

'ঠিক আছে। এখন রওনা হওয়া যায়। আঁধার হয়ে এসেছে।'

'উঠলো ইনজুন জো। প্রতিটি জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে চাইলো, দেখলো বাইরে কেউ আছে কিনা। আবার ফিরে এসে বললো, 'এদুটো কে আনলো এখানে? তোর কি মনে হয়, দোতলায় লুকিয়ে আছে ওরা?'

ধক করে উঠলো টম আর হাকের হৃৎপিণ্ড।

ছুরিটা তুলে নিলো জো। একমুহূর্ত দ্বিধা করলো। এগোলো সিঁড়ির দিকে।

উঠে ছুটে পালানোর ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করলো টম। তার বাহু খামচে ধরেছে হাক। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ উঠে আসছে। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজে অনবরত প্রতিবাদ জানাচ্ছে পুরোনো সিঁড়ি। ভারি দেহের ভার বইতে অক্ষমতা জানাচ্ছে।

হাককে নিয়ে পুরোনো আলমারিটার কাছে সরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে টম, ঠিক এই সময় বিকট মড়মড় শব্দ উঠলো। জোকে নিয়ে ভেঙে পড়লো সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ। জো-র আর্তনাদ শোনা গেল।

ছুটে এলো জো-র সঙ্গী। 'সাবধানে উঠতে পারলি না? ...হয়েছে, আর ওঠার দরকার নেই। ওপরে কেউ থেকে থাকলে লাফিয়ে নামুকগে এবার। আর পনেরো মিনিটেই পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাবে। বাক্সটা নিয়ে চলে যেতে পারবো। কেউ বেরোতে দেখলে ভাববে, ভূতপ্রেত। কাছে তো আসবেই না, পালাবে।'

ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলোতে হাত বোলাচ্ছে জো। কিছু বললো না।

ঘন হয়ে এলো অন্ধকার। বাক্সটা ধরাধরি করে নিয়ে বেরিয়ে গেল জো আর তার সঙ্গী।

আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলো টম। তারপর উঠে দাঁড়ালো। হাত-পা কাঁপছে। হাকও উঠলো। একজন একজন করে নেমে এলো সিঁড়ির রেলিং বেয়ে। ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরে। অন্ধকার। ইনজুন জো বা তার সঙ্গীকে দেখা গেল না। জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে হয়তো।

নীরবে বাড়ির দিকে রওনা হলো দুই কিশোর। ভাবতে ভাবতে চলেছে।

হঠাৎ বলে উঠলো টম, 'হাক! প্রতিশোধ নেবার কথা যে বললো জো, আমাদের ওপর না তো?'

'তাই তো! হতে পারে!' হাকের গলা শুনে মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে পড়ে

যাবে।

ব্যাপারটা নিয়ে সারা পথ আলোচনা করতে করতে এলো ওরা। গাঁয়ে এসে ঢুকলো। দুজনে দুদিকের পথ ধরলো। বাড়ির দিকে রওনা হলো টম। হাক চললো তার শুয়োরের খোঁয়াড়ে।

তেইশ

সে-রাতে ঘুমাতে পারলো না টম। কেবলই দুঃস্বপ্ন দেখে দেখে তন্দ্রা টুটে গেল তার। পরদিন সকালে নাস্তা শেষেই বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে। হাককে খুঁজে বের করলো।

'হাক,' বললো টম। 'রেড জো-কে খুঁজে বের করবো আমরা। ওই গুপ্তধনগুলো পেতেই হবে।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি। দুই নম্বরে লুকিয়ে রেখেছে জো। কিন্তু এই দুই নম্বরটা কোথায়?'

'বুঝতে পারছি না। কোনো একটা বাড়ির নম্বর হতে পারে।'

'হতে পারে। কে জানে, কোনো একটা রুম নম্বরও হতে পারে। কোনো সরাইখানায়, কি বলিস?'

'ঠিক! সরাইখানার রুম নম্বরই!'

'তাহলে চল, খুঁজে দেখি।'

'তুই থাক এখানে। আমি দেখে আসছি। বেশি দেরি হবে না।'

ঘণ্টা দেড়েক বাদে ছুটতে ছুটতে এলো টম। 'হপকিনস সরাইখানায় নেই জো,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সে। 'কম বয়েসী এক কেরানী কাজ করে সরাইখানায়। আমাকে চেনে। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

'তাহলে?'

'মিলারের খালি বাড়িটাতে থাকতে পারে, তাই বললো কেরানী। ওই বাড়ির দুই নম্বর ঘরটা থেকে অদ্ভুত শব্দ নাকি শোনা গেছে রাতের বেলা। মাঝে মাঝে ঝিড়বিড় করে কেউ, সাংঘাতিক মাতাল হলে যেমন করে লোকে। মাঝে মাঝে শোনা যায় গান...'

'প্রচুর মদ খায় রেড জো,' বলে উঠলো হাক।

'আমিও জানি। শোন, আমি একটা প্ল্যান করেছি। গলি দিয়ে ঢুকে ঘরের পেছনের দরজার কাছে চলে যাবো আমরা। চাবি জোগাড় করতে পারলে ঘরটায় ঢুকতে পারবো। পুরোনো যে-ক'টা চাবি জোগাড় করতে পারিস কর, আমিও করবো। পুরোনো ধাঁচের তালা। আমার বিশ্বাস, একআধটা চাবি লেগেও যেতে পারে। তারপর এক অন্ধকার রাতে, মানে যে রাতে চাঁদ থাকবে না, হানা দেবো আমরা। ঘরে ঢুকবো। সোনার মোহরগুলো পেয়েও যেতে পারি।'

রাজি হলো হাক।

পরের চাঁদশূন্য রাতেই মিলারের পরিত্যক্ত বাড়িতে হানা দিলো দুই কিশোর পুরোনো চাবিতে বোঝাই টমের পকেট। ঘরের পেছনের দরজার সামে চোরের মতো এসে দাঁড়ালো সে। হাঁক দাঁড়িয়ে রইলো রাস্তার একধারে চারদিকে নজর রাখছে। কাউকে আসতে দেখলেই সংকেত জানাবে বন্ধুকে।

অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল। এখনও আসছে না কেন টম! উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলে হাক। টমকে ধরে ফেলেনি তো জো! খুন করে ফেলেনি তো! কি করবে ঠি করতে পারলো না সে। এগোতে যাবে, এই সময় পড়িমরি করে ছুটে এলো টম হাকের পাশ দিয়ে যাবার সময় বললো, 'জলদি দৌড় দে, হাক! যতো জো পারিস!'

ছুটলো হাক।

ছুটতে ছুটতে গাঁয়ের শেষে একটা খামার বাড়িতে এসে ঢুকলো দুজনে জোরে জোরে দম নিচ্ছে। খানিকক্ষণ কেউই কোন কথা বলতে পারলো না। শে টম বললো, 'কাম সেরেছিলো রে, হাক! সব কটা চাবি লাগিয়ে দেখলাম তালা খুললো না। শেষে নব ধরে ঘোরাতেই খুলে গেল, তালা খোলাই ছিলো। দরজ খুলে ভেতরে পা দিয়েই...ওরেব্বাপরে!'

'কি দেখলি? জলদি বল, টম!'

'আরেকটু হলেই পা মাড়িয়ে দিয়েছিলাম জো-র!'

'কি?'

'হ্যাঁ, হাক। মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে জো।'

'দেখেনি তোকে?'

'দেখার অবস্থায় নেই। মদ খেয়ে ভোম্‌ম্‌ হয়ে আছে!'

'তাহলে তো মোহরগুলো সরিয়ে আনতে পারি। খেয়ালই করবে না ব্যাটা!'

'পারলে তুই যা। জো ব্যাটা যতোক্ষণ আছে আমি আর যাচ্ছি না।'

'তাহলে বাড়িটার ওপর নজর রাখতে হবে আমাদের। যেই জো বেরি যাবে, ব্যস, মোহর নিয়ে পালাবো।'

'হ্যাঁ, তাই করতে হবে। আমি তো রোজ রাতে বোরোতে পারবো না বা থেকে। তুই নজর রাখবি। জো বেরিয়ে গেলেই এসে বিড়ালের ডাক ডাকবি দুজনে মিলে সরিয়ে আনবো বাক্সটা।'

রাজি হলো হাক।

এরপর কয়েক রাত ভালো ঘুম হলা না টমের। চোখ লেগে আসে, আবার ছু যায়। কখন আসে হাকের ডাক! কিন্তু ডাক আর আসে না। অধৈর্য হয়ে উঠছে ট ধীরে ধীরে।

এই সময় গাঁয়ে ফিরে এলো বেকি থ্যাচার। মোহরের কথা ভুলেই গেল টম বেকিকে নিয়ে মেতে উঠলো। প্রায় সারাটা দিনই খেলে কাটায় দুজনে।

তারপর একদিন উঠলো পিকনিকের কথা। বেকির মা আগেই রাজি ছিলেন নতুন করে রাজি করাতে হলো না। বন্ধু-বান্ধবীদের কাছে দাওয়াত পাঠালে বেকি। নির্দিষ্ট দিনে সবাই এসে হাজির হলো মিস্টার থ্যাচারের বাড়িতে।

মিসেস থ্যাচার বললেন, 'বেকি, ফিরতে ফিরতে নিশ্চয় রাত হয়ে যাবে। একা আসিস না বাড়িতে। রাতটা সুসান হারপারের সঙ্গেই কাটিয়ে দিস।'

সায় জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো বেকি। রওনা হলো বন্ধুদের সঙ্গে।

টমের পাশাপাশি হাঁটছে বেকি। ফেরিঘাটের দিকে। ফেরিতে করে মাইল তিনেক ভাটিতে নেমে যাবে ওরা। ওখানে বন আছে, পাহাড়ের গুহাও আছে। পিকনিকের জন্যে চমৎকার জায়গা।

টম বললো, 'বেকি, সুসানের বাড়িতে থেকো না। উইডো ডগলাসের ওখানে চলে এসো। মহিলা খুবই ভালো। আর যা মজার কেক বানায়! আমিও থাকবো ওখানে। রাত কাটিয়ে সকালে যার যার বাড়ি ফিরে যাবো।'

'কিন্তু...মা জানলে রাগ করবে।'

'জানতেই পারবে না। কে বলতে যাচ্ছে?'

আর আপত্তি করলো না বেকি।

হঠাৎ হাকের কথা মনে পড়লো টমের। 'আমাকে তো বাড়ি ফিরে যেতে হবে!' ভাবলো টম। 'নইলে হাক এসে ফিরে যাবে। আমি কোথায় আছি জানবে না। খুঁজেও বের করতে পারবে না!' তারপরই ভাবলো সে। 'না, আজ রাতে আসবে না হাক।' রাতে বাড়ি ফিরে যাবার চিন্তা বাদ দিলো টম। 'আজ রাতে উইডো ডগলাসের ওখানেই থাকবো। বেকি থাকবে। মজা হবে খুব।'

ফেরিতে এসে উঠলো সবাই। ছেড়ে দিলো ফেরি। নেমে চললো ভাটির দিকে।

বনের ধারে এসে ভিড়লো ফেরি। হৈ-হৈ করতে করতে নেমে পড়লো সবাই। বনে এসে ঢুকলো।

ভীষণ গরম পড়েছে। বনের ভেতরে গাছের ছায়ায় এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ওরা। দুপুরের আগে পর্যন্ত খেলে কাটালো ছেলেমেয়েরা। খাওয়া তৈরি হলো। একসঙ্গে বসে খেলো সবাই। তারপর বিরাট একটা গুহায় ঢুকলো গিয়ে।

গুহার ভেতরে অন্ধকার, ঠাণ্ডা। হাতে করে মোমবাতি নিয়ে ঢুকেছে ছেলেমেয়েরা। জ্বালিয়ে নিলো। মোমের আলোয় পথ দেখে এগোলো। বেশি গভীরে গেল না। গোলক-ধাঁধার মতো ছড়িয়ে আছে অসংখ্য সুড়ঙ্গ। একটা থেকে আরেকটা আলাদা করে চেনার উপায় নেই। একবার পথ হারালে বেরিয়ে আসার আশা সামান্যই।

ছেলেমেয়েদের হৈ-চৈয়ে মুখরিত হয়ে উঠলো নিস্তব্ধ গুহা।

দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে এলো। পরিশ্রান্ত হয়ে গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ছেলেমেয়েরা। এবার বাড়ি ফিরতে হবে।

ফেরিতে উঠতে উঠতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

সারাটা দিন সাংঘাতিক উত্তেজনায় কেটেছে। সবাই পরিশ্রান্ত। বাড়ি ফেরার আগে উদ্বিগ্ন। অন্ধকারে কেউই খেয়াল করলো না, টম আর বেকি নেই ওদের মাঝে। আসেনি।

চব্বিশ

আগের কয়েকদিনের মতোই সে-রাতেও গলির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে হাক। নজ রেখেছে মিলারের বাড়ির দু'নম্বর ঘরের পেছনের দরজার ওপর।

সময় কাটছে। গভীর হলো রাত। বার বার হাই তুলছে হাক, ঘুম পেয়েছে নাহ্, আজও বেরোবে না ওরা, ভাবলো সে। বরং চলেই যাই। গিয়ে ঘুমোইগে।

ঘুরতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালো হাক। খুলে গেছে দরজা। চট্ করে বাড়ি ছায়ায় লুকিয়ে পড়লো সে। চোখ রাখলো দরজার পর। দুজন লোক বেরি এলো। হাতে ধরাধরি করে এনেছে একটা বাক্স। নিশ্চয় মোহরের।

বাক্স নিয়ে রাস্তায় নামলো ওরা। এগিয়ে চললো।

কোথায় যায়, দেখতে হবে। বাক্সটা কোথাও লুকিয়ে রাখার জন্যে নি যাচ্ছে নিশ্চয় ওরা। পিছু নিলো হাক। অনুসরণ করে চললো নিঃশব্দে।

নদীর ধারে চলে এলো দুই ডাকাত। খানিকক্ষণ এগিয়ে চললো নদীর পা পাড়ে। তারপর মোড় নিলো।

আরে, উইডো ডগলাসের বাড়ির দিকে যাচ্ছে ওরা, অবাক হয়ে ভাবলে হাক। পিছু ছাড়লো না সে। অন্ধকার রাত। আকাশে চাঁদ নেই। অনুসরণ করে সুবিধে হচ্ছে তার।

ডগলাসের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো দুই ডাকাত।

হাকও দাঁড়িয়ে পড়লো। দুজনের কাছাকাছিই রয়েছে। কথা শুনতে পেলো।

'তিনটে ঘরেই বাতি জ্বলছে। কেউ রয়েছে মেয়েমানুষটার সঙ্গে,' চাপা গলা বললো জো। রাগ প্রকাশ পেলো গলার স্বরে।

'আজ রাতে আর কিছু করতে পারবি না,' বললো জো-র সঙ্গী। 'আয়, চ যাই। ভুলে যা ওর কথা।'

'ভুলে যাবো!' কর্কশ গলা জো-র। 'কক্ষনো না! লোকের সামনে ঘোড়া চাবুক দিয়ে পিটিয়েছে আমাকে ডগলাস হারামজাদা। জেলে পাঠিয়েছে। জে বসেই প্রতিশোধ নেবার কথা ভেবেছি। জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম এখানে কিন্তু আমাকে ফাঁকি দিয়ে পরপারে চলে গেছে তখন ডগলাস। ব্যাটাকে পাইনি বেটিকে পেয়েছি। তার ওপরই নেবো প্রতিশোধ।'

'মহিলাকে খুন করবি তুই?'

'না না। ডগলাসকে পেলে অবশ্য খুন করতাম। কিন্তু মেয়েমানুষকে খু করার ইচ্ছে নেই আমার। সুন্দরী মেয়েদের খুব নজর থাকে নিজেদের রূপে প্রতি। আমি সেই রূপ নষ্ট করে দেব বিধবাটার। খাটের সঙ্গে বাঁধবো আগে। ক্ষু করে কেটে নেবো নাকের ডগা। একে একে কেটে নেবো দুই কান। ব্যস, একটি মাদী শুয়োরের মতো লাগবে তখন দেখতে। ওই চেহারা নিয়ে ঘর থেকে বেরোতে পারবে না। আর রক্তক্ষরণে যদি মরেই যায়, আমার কিছু করার নেই

কি বলিস?' হা হা করে কুৎসিত হাসি হাসলো জো।

শিউরে উঠলো হাক।

'না না, এমন কাজ করিস না, জো!' প্রতিবাদ করলো তার সঙ্গী।

'করবো! এবং তুই সাহায্য করছিস আমাকে।'

বিড়বিড় করে আপনমনেই কি যেন বললো লোকটা, বুঝতে পারলো না হাক।

'আলো নেভা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো আমরা। তারপর ঢুকবো,' আবার বললো জো।

তুমুল ভাবনা চলেছে হাকের মাথায়। এখানে অপেক্ষা করে লাভ নেই। কিছু একটা করতে হবে উইডো ডগলাসের জন্যে, দ্রুত। নিঃশব্দে পিছিয়ে এলো সে। নিরাপদ দূরত্বে এসেই ঘুরলো। ছুটলো।

মিস্টার জোনসের বাড়ির দিকে ছুটছে হাক। দিলদরিয়া, সৎ, সাহসী লোক মিস্টার জোনস। তাঁর বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিলো হাক।

'কে?' ভেতর থেকে সাড়া দিলেন মিস্টার জোনস।

'আমি। জলদি খুলুন! কথা আছে!'

'আমি কে! এতো রাতে কি কথা! দাঁড়াও, খুলছি।'

দরজা খুলে দিলেন মিস্টার জোনস। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর দুই বলিষ্ঠ ছেলে। হাককে দেখেই চোখ কপালে উঠলো তাঁর। 'আরে, হাকলবেরি ফিন! তুই এতো রাতে!'

'আমাকে ঢুকতে দিন আগে!' অনুনয় ঝরলো হাকের গলায়। 'সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে!'

কি যেন ভাবলেন মিস্টার জোনস। সরে জায়গা করে দিলেন। ঘরে ঢুকলো হাক। মেঝেতে বসে পড়লো।

দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো মিস্টার জোনসের এক ছেলে।

সব কথা শোনালো ওদের হাক।

মিনিট তিনেক পরেই বন্দুক হাতে উইডো ডগলাসের বাড়ির দিকে ছুটলেন মিস্টার জোনস। সঙ্গে তার দুই ছেলে। ওদের হাতেও বন্দুক।

আলো নেই উইডো ডগলাসের বাড়ির জানালায়। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন মিস্টার জোনস, সঙ্গে দুই ছেলে।

হাক দূরে অপেক্ষা করে রইলো।

রাতের নীরবতা খান খান করে দিয়ে হঠাৎ গর্জে উঠলো বন্দুক। আবার। তারপর আবার।

আর দাঁড়ালো না হাক। গোলাগুলির মাঝে দাঁড়িয়ে থাকাটা নিরাপদ না। তাছাড়া এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোনরকম সাহায্যও করতে পারবে না সে। ঘুরেই ছুটলো। কোনদিকে তাকালো না। যতো জোরে সম্ভব, ছুটে চললো গাঁয়ের দিকে।

পঁচিশ

পরদিন খুব সকালে আবার গিয়ে মিস্টার জোনসের দরজায় ধাক্কা দিলো হাক। ভেতর থেকে সাড়া আসতেই নিজের নাম জানালো।

'আয়, ভেতরে আয়,' ডাকলেন মিস্টার জোনস। হাক ভেতরে ঢুকতেই বললেন, 'তুই একটা সাহসী ছেলে, হাক। খুব ভালো ছেলে। আমার দরজা সব সময় খোলা থাকবে তোর জন্যে, যখন খুশি চলে আসবি। বোস। নাস্তা তৈরি হয়ে যাবে এখুনি।'

টেবিলে খাবার দেয়া হলো। বাড়ির আর সকলের সঙ্গে হাকও গিয়ে বসলো। ভালো খাবার। কিন্তু রুচি নেই তার। খেতে পারলো না।

'তোর মুখচোখ কেমন শুকনো শুকনো লাগছে, হাক,' বললেন মিস্টার জোনস। 'শরীর খারাপ না তো! নে, চা-টা খেয়ে নে। ভালো লাগবে।'

চা খেতে খেতে রাতে কি ঘটেছিলো, জানালেন মিস্টার জোনস। বললেন, 'ওদের ধরতে পারিনি। তবে একটাকে আহত করেছি। বেশি দূরে যেতে পারবে না ব্যাটা। গাঁয়ের লোকদের জানিয়ে দিয়েছি। আরেকটু বেলা হলেই বেরোবে লোকে। বনের ভেতর ডাকাত দুটোর খোঁজ করবে। ওদের চেহারার বর্ণনা দিতে পারবি?'

'একটা সেই স্প্যানিয়ার্ড, গাঁয়ে মাঝে মাঝে দেখা যেতো। সাদা লম্বা চুল, গোঁফ। কথাও বলতে পারে না, কানেও শোনে না। আরেকটা লোক এ-অঞ্চলে নতুন। কোথা থেকে এসেছে, কে জানে! লম্বা, রোগা। পুরোনো ছেঁড়া কাপড় পরে।'

'দুজনকেই চোখে পড়েছে আমার, গাঁয়ের পথে কিংবা সরাইখানায়,' বললেন মিস্টার জোনস। 'আচ্ছা, ওদেরকে অনুসরণ করেছিলি কেন? কি এমন চোখে পড়েছিলো?'

'ঘুম আসছিলো না,' মিছে কথা বললো হাক। 'একটু হাঁটাহাঁটি করতে বেরিয়েছিলাম। দেখলাম একটা ভারি বাক্স বয়ে নিয়ে চোরের মতো এগিয়ে যাচ্ছে লোক দুটো। ভাবলাম, কারো বাড়ি থেকে কিছু চুরি করে পালাচ্ছে। পিছু নিলাম। নদীর দিকে চললো ওরা, আমিও চললাম। তারপর উইডো ডগলাসের বাড়ির দিকে মোড় নিলো। ওদের একেবারে পেছনেই ছিলাম। কথাবার্তা সব শুনেছি এজন্যেই। স্প্যানিয়ার্ডটা উইডো ডগলাসের কান-নাক কাটার কথা বলতেই আঁতকে উঠলাম...

'স্প্যানিয়ার্ডটা কথা বললো! বোবা-কালা না সে?'

'না না। ও হলো...' মুখ ফসকে নামটা প্রায় বলেই ফেলেছিলো হাক, থেমে গেল। অনেক বেশি বলে ফেলেছে মিস্টার জোনসকে এমনিতেই। এখনো ধরা পড়েনি জো, ঝুঁকিটা নেয়া উচিত হবে না।

'ও-কে?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার জোনস। 'চুপ করে গেলি কেন, হাক? বল। ভয়ের কিছু নেই। আমরা তোর ভালো চাই। আমাদের বিশ্বাস করতে পারিস। তোর সব কথা গোপন রাখবো।'

মিস্টার জোনসের নরম ব্যবহার আর অভয় প্রদানের পর আর চুপ করে থাকতে পারলো না হাক। বলে ফেললো, 'ইনজুন জো!'

'ইনজুন জো!' উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়লেন মিস্টার জোনস। বসে পড়লেন আবার। 'রেড জো!' বিশ্বাস করতে পারছেন না যেন তিনি।

'হ্যাঁ, রেড জো।'

'ঠিক বলেছিস তো?'

'ঠিক। ওর গলা ভালো করেই চিনি আমি।'

'বেশ!' চুপ করে গেলেন মিস্টার জোনস। গভীর ভাবনা চলেছে তাঁর মনে।

খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে হাকের দিকে চেয়ে আছে জোনসের দুই ছেলে। হাঁ হয়ে গেছে মুখ, চোখ বড় বড়।

'হ্যাঁ, এবার বুঝতে পারছি কেন মহিলাকে মারতে গিয়েছিলো...' বলতে বলতেই থেমে গেলেন মিস্টার জোনস। ঘরে এসে ঢুকেছে উইডো ডগলাস। ডাকাতদের খবরাখবর জানতে এসেছেন তিনি।

রাতে কি কি ঘটেছে মহিলাকে জানালেন মিস্টার জোনস।

কেঁদে ফেললো উইডো। বললো, 'কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো, মিস্টার জোনস! গত রাতে আমার জান বাঁচিয়েছেন!'

'আমাকে নয়,' বললেন মিস্টার জোনস। হাককে দেখাতে গিয়েই থেমে গেলেন। হাকের কথা গোপন রাখবেন, কথা দিয়েছেন। রেড জো-র কানে কথাটা গেতে পারে। তাহলে ছেলেটাকে ধরে খুন করে ফেলবে সে। ওকে গোলমালে ফেলানো ঠিক হবে না।

রোববারের সুন্দর সকাল। ছেলেমেয়েদের জন্যেও সুন্দর, কারণ রোববারে স্কুল নেই। কিন্তু তাই বলে গির্জা ছুটি না। তবে ওখানে পড়া দিতে হয় না, কাজেই ভয়ের কিছু নেই।

নির্দিষ্ট সময়ে গির্জায় এলো গাঁয়ের লোকে। কেউ ভেতরে ঢুকে পড়লো, কেউ দরজায় দাঁড়িয়ে একে অন্যের খবরাখবর নিতে লাগলো।

মিসেস হারপারকে পাকড়াও করলেন মিসেস থ্যাচার। 'এখনো বুঝি সুসানের সঙ্গেই আছে বেকি? ভালো ভালো, আপনার বাড়িতে থাকলে ভালোই থাকবে।'

'বেকি! আমার বাড়িতে!' খুব অবাক হলেন মিসেস হারপার।

'কেন! গত রাতে পিকনিক থেকে ফিরে আপনার বাড়িতে যায়নি বেকি?' জানতে চাইলেন মিসেস থ্যাচার। চোখে শঙ্কার ছায়া।

'না।'

হঠাৎ যেন অসুস্থ হয়ে পড়লেন মিসেস থ্যাচার। ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। পা

কাঁপছে। এগিয়ে গিয়ে কোনমতে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লেন।

এই সময় এলেন পলি খালা। দুজনের কাছে এগিয়ে এলেন। 'মিসেস থ্যাচার, কাল বেকির সঙ্গে পিকনিকে গিয়েছিলো টম। গত রাতে বাড়ি ফেরেনি। আবার বোধহয় বাড়ি থেকে পালালো! আপনার বাড়িতে রাত কাটিয়েছিলো?'

মিসেস হারপারকে জিজ্ঞেস করেও একই জবাব পেলেন পলি খালা। এই সময় সেখানে এসে দাঁড়ালো জো হারপার। খালা জিজ্ঞেস করলেন, 'আরে জো! টম কোথায় জানিস?'

'না খালা। গতকাল আমাদের সঙ্গেই পিকনিকে গিয়েছিলো...'

'ফেরার সময় ফেরিতে উঠেছিলো তো?'

'তাই তো!' অবাক হয়ে গেছে জো। 'গতকাল ফেরিতে ওকে দেখেছি বলে তো মনে হয় না! না, দেখিনি!'

একে একে অনেক ছেলেকেই জিজ্ঞেস করলেন পলি খালা। কিন্তু টমের খবর দিতে পারলো না কেউ। টম বা বেকিকে ফেরার সময় ফেরিতে উঠতে দেখেনি কেউ।

ওখানেই বসে পড়লেন পলি খালা। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'ওরা...ওরা গুহায় পথ হারিয়েছে!'

গাঁয়ের সবাই এসে ঘিরে ধরলো দুই মহিলাকে,–যাঁদের ছেলেমেয়ে হারিয়েছে। সবাই সায় দিলো পলি খালার কথায়, পথই হারিয়েছে টম আর বেকি। ছেলেমেয়ে দুটোকে খুঁজতে যেতে তৈরি হলো সবাই। কিন্তু আগে প্রার্থনা শেষ করতে হবে।

প্রার্থনা জমলো না মোটেই। কোনমতে দায়সারা গোছে সারা হলো। শ'দুয়েক লোক বেরিয়ে পড়লো টম আর বেকিকে খুঁজতে। তাদের সঙ্গে রইলেন বেকির বাবা, জজ থ্যাচার।

ফেরিতে করে সেই বনের ধারে এলো সবাই। গুহার ভেতরে ঢুকলো।

গাঁয়ে দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করে আছে মেয়েরা। কয়েক ঘণ্টা পরে খবর এলো জজ থ্যাচারের কাছ থেকে: 'আরো দড়ি এবং মোমবাতি পাঠাও। খাবারও পাঠিও।'

সবই পাঠানো হলো। কিন্তু আর কোনো খবর আসছে না জজ সাহেবের কাছ থেকে। আর সইতে পারছেন না পলি খালা, বেকির মা-ও ভেঙে পড়েছেন। শয্যা নিলেন দুজনেই।

মিস্টার জোনসের বাড়ি গিয়ে আবার হাজির হলেন উইডো ডগলাস। বাড়িতে কেউ নেই, সবাই গেছে টম আর বেকিকে খুঁজতে। বিছানায় একা পড়ে কোকাচ্ছে হাক। সাংঘাতিক অসুস্থ।

এগিয়ে গিয়ে হাকের মাথায় হাত রাখলেন উইডো ডগলাস। চমকে উঠলেন। সাংঘাতিক জ্বর। ডাক্তারকে যে খবর দেবেন, সে উপায়ও নেই। ডাক্তারও গেছে টম আর বেকিকে খুঁজতে। অগত্যা নিজেই লেগে গেলেন হাকের সেবায়। ধনীর এক রূপসী বিধবা স্ত্রী নন এ-মুহূর্তে, অসুস্থ ছেলের বিছানার পাশে স্নেহময়ী

মাতা।

সার্চ পার্টির কাছ থেকে খবর এলো বিকেল বেলা, টম আর বেকির গুহায় অবস্থানের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। একটা পাথরে নিজেদের নাম লিখে রেখেছে ওরা: 'টম' এবং 'বেকি'।

সেদিন ফিরে এলো না সার্চ পার্টি। পরের দিনও না। দু'দিন ধরে চললো সমানে খোঁজা। কিন্তু পাওয়া গেল না ছেলেমেয়ে দুটোকে। আর কিছুই করার নেই। হতাশ হয়ে ফিরে এলো লোকেরা।

বিছানা নিলেন মিসেস থ্যাচার। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মেয়ের চিন্তায়।

কিন্তু টম মরে গেছে, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না পলি খালা। টমের ফিরে আসার অপেক্ষায় রইলেন তিনি। প্রার্থনা জানাতে থাকলেন ঈশ্বরের কাছে।

ছাব্বিশ

আর সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই গুহায় এসে ঢুকেছে টম আর বেকি। হাত ধরাধরি করে ঢুকে গেছে একটা সুড়ঙ্গে। অন্যদের চেয়ে অনেক গভীরে ঢুকে পড়েছে ওরা। খেয়ালই নেই, অনেক পেছনে রয়েছে দলের অন্যেরা।

একটা সরু পাতাল-ঝর্নার কাছে এসে থামলো ওরা। বসে পড়লো। বিশ্রাম নেবে খানিক।

আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ চোখে পড়লো টমের। কৌতূহল হলো। সেটা দেখিয়ে বেকিকে বললো, 'চলো, ওতে ঢুকে পড়ি। কি আছে ভেতরে দেখবো।'

বেকি রাজি। দুজনে ঢুকে পড়লো নতুন সুড়ঙ্গে। এগিয়ে চললো আরো গভীরে। বুদ্ধি করে চুনাপাথর দিয়ে চিহ্ন দিয়ে দিয়ে চললো টম। 'ফেরার পথে এগুলো সাহায্য করবে আমাদের।'

এগিয়েই চললো দুজনে। হঠাৎ মাথার ওপর ডানা ঝাপটানোর ফড়ফড় শব্দ উঠলো, একসঙ্গে অনেক। বাদুড়। আশপাশ আর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বাদুড়ের ঝাঁক। বেকির বাতির কাছ দিয়ে উড়ে গেল একটা। ওটার ডানার ঝাপটায় দপ করে নিবে গেল মোমবাতি। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলো বেকি। আসছে তো আসছেই বাদুড়। হাজার হাজার। টমও ভয় পাচ্ছে। রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের কথা মনে পড়ে গেল তার। বেকির এক হাত চেপে ধরেই দৌড় মারলো।

কতোক্ষণ দৌড়ালো ওরা, বলতে পারবে না। হঠাৎ খেয়াল করলো, মাথার ওপর ডানা ঝাপটানোর শব্দ নেই। থেমে দাঁড়ালো। হাঁপাচ্ছে। ধপ করে ওখানেই বসে পড়লো বেকি। তার পাশে বসলো টম।

ভীষণ নীরব সুড়ঙ্গ। 'টম, চল বেরিয়ে পড়ি,' আতঙ্কে গলা কাঁপছে বেকির। 'পথ খুঁজে পাবে?'

'নিশ্চয় পাবো,' বললো টম। 'কিন্তু অন্য পথ ধরতে হবে আমাদের।

বাদুড়গুলো যেদিকে রয়েছে সেদিক দিয়ে যেতে চাই না আর।'

বেকির হাত ধরে আবার হাঁটতে লাগলো টম। চলছে তো চলছেই। পথ আর ফুরায় না। এক সময় বুঝতে পারলো টম পথ হারিয়েছে। কিন্তু সে-কথা বললো না, তাহলে ভয় পাবে বেকি।

চলতে চলতেই কাঁদতে লাগলো বেকি। কেঁদে কেঁদে বললো, 'টম, আর পথ খুঁজে পাবো না আমরা! আর ফিরে যেতে পারবো না! কক্ষনো না!'

'পারবো বেকি,' দৃঢ় গলায় বললো টম। 'পারতেই হবে আমাদেরকে!'

এগিয়ে চলেছে দুজনে। মাঝে মাঝে থেমে বিশ্রাম নিচ্ছে।

হাতের মোমটা ধরিয়ে নিতে চাইলো বেকি, মানা করলো টম। 'একটার আলোয়ই দেখতে পাবো আমরা। খামোকা দুটো মোম একসঙ্গে ক্ষয় করে লাভ নেই।'

চলতেই থাকলো ওরা। আর পারছে না। সাংঘাতিক শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ফোঁপাচ্ছে বেকি। সুড়ঙ্গের একটা বাঁক ঘুরেই পাতাল-ঝর্নার কাছে এসে পড়লো দুজনে। ভালো করে দেখে বললো টম, 'এটা আরেকটা ঝর্না। আগেরটা না।'

ধপ করে বসে পড়লো বেকি ঝর্নার ধারে। 'আর পারছি না আমি, টম! পা আর চলছে না! খিদেও পেয়েছে।'

বেকি খিদের কথা বলতেই মনে পড়ে গেল টমের, বড় একটা কেক পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিলো লাঞ্চের সময়। ওটা বের করলো পকেট থেকে। ভেঙে দু'টুকরো করলো। একটা টুকরো রেখে দিলো পকেটে। আরেকটা টুকরোকে ভাঙলো। বেশিরভাগ তুলে দিলো বেকির হাতে।

টমের মোমটা শেষ হয়ে গেল। বেকিরটা ধরালো টম। 'এটাই শেষ। নিবে গেলেই গেছি। যাকগে, ওসব ভেবে লাভ নেই।'

নীরবে খাওয়া শেষ করলো ওরা। ঝর্না থেকে পানি খেলো পেট পুরে।

'আমাদের খুঁজতে আসবে ওরা নিশ্চয়, না টম?'

'হ্যাঁ। হয়তো এখুনি খুঁজছে...' বলতে বলতেই থেমে গেল টম। মনে পড়ে গেল, তাদের খোঁজ পড়বে না আজ রাতে। বেকির মা ধরেই নেবে, বেকি সুসানের সঙ্গে রয়ে গেছে। পলি খালাও খুব একটা খোঁজাখুঁজি করবে না আজ রাতে। আসার সময় বলে এসেছে টম, বেকিদের বাড়িতে রাত কাটাবে। কেন যে মিথ্যে কথা বলতে গেল!

ভয়ে কথাবার্তা তেমন জমলো না ওদের। ক্ষয় হয়ে আসা মোমের দিকে চেয়ে বসে রইলো চুপচাপ। এক সময় শেষ হয়ে এলো মোম। দপ দপ করে বার দুই লাফ দিয়েই নিবে গেল আলো। চারদিক থেকে এসে যেন ছেলেমেয়ে দুটোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো গাঢ় অন্ধকার।

আবার কাঁদতে লাগলো বেকি। কেঁদেই চললো। সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পেলো না টম। দেবেই বা কি? সে নিজেও আতঙ্কিত।

কাঁদতে কাঁদতেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো বেকি।

টমও শুয়ে পড়লো বেকির পাশে।

কতোক্ষণ ঘুমিয়েছে ওরা বলতে পারবে না। ঘুম ভাঙলো এক সময়। তেমনি রয়েছে গাঢ় অন্ধকার। সকাল হয়েছে কি হয়নি, বোঝার উপায় নেই। খিদেয় জ্বলছে পেট। পকেট থেকে আধখানা কেক বের করে দুজনে ভাগ করে খেলো আবার। ঝর্না থেকে পানি খেলো।

এই সময় দূর থেকে একটা স্পষ্ট শব্দ ভেসে এলো। 'আমাদের খুঁজতে এসেছে ওরা!' খুশি হয়ে উঠলো বেকি। 'এই যে আমরা, এখানে!' চেঁচিয়ে সাড়া দিলো সে। সুড়ঙ্গের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিহত হয়ে ফিরে এলো শব্দ: 'এখানে! ...এখানে! ...এখানে!' ভয় পেয়ে চুপ করে গেল বেকি।

অপেক্ষা করতে লাগলো ওরা। কিন্তু কেউ এলো না। অনেক আগেই থেমে গেছে অস্পষ্ট শব্দটা।

আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে উঠে পড়লো টম। পকেট থেকে সুতোর বাণ্ডিল বের করলো, ঘুড়ি উড়ানোর সুতো। এক প্রান্ত একটা পাথরের সঙ্গে বাঁধলো।

'কি করছো?' জানতে চাইলো বেকি।

'চেষ্টা করে দেখবো। এভাবে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। তুমি থাকো এখানে। নড়ো না। আমি দেখে আসছি।'

'টম, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো!' কাঁদো কাঁদো গলায় বললো বেকি। 'একা একা সাংঘাতিক ভয় লাগবে আমার!'

সুতো ধরে ধরে এগিয়ে চললো টম। একটা সুড়ঙ্গের মাথায় এসেই থমকে দাঁড়ালো। ওপাশে আরেকটা সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে আবছা আলো আসছে। দ্রুত এগিয়ে আসছে আলোটা, বাড়ছে ক্রমেই। এসেছে, এসে গেছে ওরা! আনন্দে দুলে উঠলো টমের মন। 'আমরা এখানে!' বলে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও থেমে গেল। ধক্ করে উঠলো হৃৎপিণ্ড। সুড়ঙ্গের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে একটা লোক। হাতে মোম। ইনজুন জো!

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে টম। পিছিয়ে আসার কথাও ভুলে গেছে। তাকে দেখে ফেলতে পারে জো, সেকথাও ভুলে গেছে যেন।

কিন্তু টমের দিকে চাইলো না জো। গভীর চিন্তায় মগ্ন, ভাব দেখেই বোঝা গেল।

টমের ধার দিয়েই আরেক দিকে চলে গেল ইনজুন জো।

আবার অন্ধকার হয়ে গেল সুড়ঙ্গ। সুতো ধরে ধরে আবার আগের জায়গায় ফিরে এলো টম।

সাতাশ

তিন দিন পেরিয়ে গেছে। ফিরে এলো না টম আর বেকি। হতাশ হয়ে ফিরে আসছে সার্চ পার্টি।

গির্জায় এসে ভিড় করলো গাঁয়ের লোক। গায়েবী প্রার্থনা সারা হলো ছেলেমেয়ে দুটোর আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে। এই সময়টুকুতে বারবার দরজার দিকে ফিরে চেয়েছেন পলি খালা। যদি আগের বারের মতোই এসে হাজির হয় টম! না, এলো না সে।

বিষণ্ন মুখে বাড়ি ফিরে গেল সবাই।

মাঝরাতে হঠাৎ বেজে উঠলো গির্জার ঘণ্টা, ভিন্নভাবে। চমকে জেগে উঠলো গাঁয়ের লোকে। কি হলো! কি হলো! তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সবাই। খবর শুনে খুশি হলো। বিষণ্নতা আর রইলো না। ফিরে এসেছে ছেলেমেয়ে দুটো। সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।

খুশিতে নাচতে লাগলো গাঁয়ের লোকে। ঘিরে ধরলো এসে টম আর বেকিকে। সে-রাতে আর ঘুমাতে গেল না কেউ। হাসি আনন্দে মেতে উঠলো।

পালা করে কাঁধে তুলে জজ থ্যাচারের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো বেকি আর টমকে। পলি খালা খবর পেয়ে ছুটে গেলেন থ্যাচারের বাড়িতে। সিড আর মেরিও গেল।

আগে খাওয়ানো হলো ছেলেমেয়ে দুটোকে। তারপর কথা শুনতে বসলো সবাই।

টম বলে গেল, '...সাংঘাতিক খিদে পেয়েছে আমাদের। খাবার নেই। কি করবো? পানিই খেলাম পেট পুরে দুজনে। বেকিকে নিয়ে উঠলাম। দুজনেই ক্লান্ত। সুতোর একটা মাথা পাথরে বেঁধে সুতো ধরে ধরে এগিয়ে গেলাম। পাঁচ-ছ'টা সুড়ঙ্গমুখ একই জায়গায়। কয়েকটা সুড়ঙ্গে ঢুকে ফিরে এলাম। শেষে ঢুকলাম আরেকটাতে। চলছি তো চলছিই। সুতো ফুরিয়ে এলো। হতাশ হয়ে পড়েছি। এই সময় মনে হলো আলো দেখতে পাচ্ছি। তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে বেকিকে নিয়ে এলাম। সুতো শেষ হতেই ছেড়ে দিলাম প্রান্তটা। আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে চললাম। বাড়ছে আলো। শেষে এসে দাঁড়ালাম সুড়ঙ্গমুখে। যেদিক দিয়ে ঢুকেছিলাম তার অনেক দূরে। একেবারে নদীর পাড়ের কাছে বেরিয়ে এসেছে এই সুড়ঙ্গটা। তারপর আর কি? নদীর ধার ধরে গাঁয়ে ফিরে এসেছি।'

টমের প্রশংসা করে যার যার বাড়ি ফিরে গেল লোকেরা। টমকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন পলি খালা।

আরেকবার গাঁয়ের ছেলেদের কাছে হীরো হয়ে উঠলো টম। সকাল হতেই হাকের খোঁজ নিলো সে। শুনলো, সাংঘাতিক অসুস্থ হাক। মিস্টার জোনসের বাড়িতে আছে। বন্ধুকে দেখতে চললো টম।

অনেক ভালো হয়ে উঠেছে হাক। তাকে দেখাশোনা করছেন উইডো ডগলাস। ছন্নছাড়া ছেলেটাকে ভালোবেসে ফেলেছেন তিনি ইতিমধ্যেই।

হাকের বিছানার পাশে এসে বসলো টম। বন্ধুকে দেখে খুশি হয়ে উঠলো হাক। অনেকক্ষণ ধরে গুজগুজ ফিসফিস করলো দুজনে।

'রেড জো-র দোস্তকে পাওয়া গেছে, টম,' এক সময় জানালো হাক। 'নদীতে' ভাসছিলো তার লাশ।'

'ডুবে মরেছে?'

'লোকে বলাবলি করছে, বন্ধুকে খুন করে নদীতে ফেলে দিয়েছে জো।'

শিউরে উঠলো একবার টম। 'জোকে দেখেছি আমি সুড়ঙ্গে, হাক। কাউকে বলিনি।'

আরো কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর 'আবার আসবে' বলে বেরিয়ে এলো টম।

দিন কয়েক পরে। বেকিদের বাড়িতে গেল টম। এখন রোজই ও-বাড়িতে যাতায়াত করে সে। বাধা নেই। স্কুলে কি করে শাস্তি নিজের পিঠে তুলে নিয়ে বেকিকে বাঁচিয়ে দিয়েছে টম, বাপকে বলেছে বেকি। খুব খুশি জজ থ্যাচার। প্রশংসা করে বলেছেন: ভবিষ্যতে ভালো সৈনিক হতে পারবে টম। তাকে মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করতে সহায়তা করবেন, জানিয়েছেন।

বাড়িতে ঢুকেই বৈঠকখানায় বেকির বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল টমের। বেকিও ওখানেই আছে।

কথায় কথায় সুড়ঙ্গের কথা উঠে পড়লো। জজ থ্যাচার বললেন, 'ওই সুড়ঙ্গে আর কেউ কখনো ঢুকতে পারবে না। লোহার দরজা দিয়ে গুহামুখ বন্ধ করে দিয়েছি।'

'বন্ধ করে দিয়েছেন!' ফ্যাকাসে হয়ে গেল টমের মুখ। চেঁচিয়ে উঠলো, 'রেড জো রয়ে গেছে সুড়ঙ্গের ভেতর!'

'রেড জো!'

কি করে সুড়ঙ্গে ইনজুন জো-র দেখা পেয়েছে টম, জানালো।

উঠে পড়লেন জজ থ্যাচার। লোকজন নিয়ে তখুনি রওনা হলেন গুহার দিকে।

আবার খোলা হলো লোহার দরজা। দরজার কাছেই পড়ে আছে জো-র লাশ। ভাঙা ছুরিটা পড়ে আছে লাশের পাশেই। ছুরি দিয়ে লোহার দরজার তলার পাথুরে মাটি খুঁড়ে পথ করার চেষ্টা করেছিলো। ছুরিটা ভেঙে যাওয়াতেই হয়তো পারেনি। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ধুঁকে ধুঁকে মরেছে।

ইনজুন জো-কে কেউ দেখতে পারে না। কিন্তু তার এই করুণ পরিণতি নাড়া দিলো সবার মনকেই। লাশটাকে গুহার ভেতরেই কবর দিয়ে ফিরে এলো লোকেরা।

আটাশ

রেড জো মারা যাওয়াতে মোটেই দুঃখিত হলো না টম আর হাক, খুশিই হলো। খুনেটার ভয়ে কতোদিন ঘুমোতে পারেনি রাতে! 'ভয়' বিদেয় হয়েছে এখন। নিরাপদে এখন গুপ্তধনের সন্ধান করতে পারবে ওরা।

'মিলারের বাড়িতে নেই মোহরগুলো,' একদিন টমকে বললো হাক। 'খুঁজে দেখেছি।'

'আমি জানি কোথায় আছে,' বললো টম। 'ওই গুহায়। ওগুলো আনতে যাে আমি। তুই যাবি?'

'নিশ্চয়। এখন আর জ্বর নেই আমার, ভালো হয়ে গেছি।'

'তাহলে আজ দুপুরেই যাবো। সঙ্গে করে গাঁইতি-কোদাল নিয়ে যাবো। প্রচু সুতলি, মোম আর খাবারও নিতে হবে ব্যাগে করে। ও হ্যাঁ, দেশলাইও নিে হবে। ওই ভয়ানক সুড়ঙ্গে আর পথ হারাতে চাই না।'

দুপুরের খাওয়া সেরে তৈরি হয়ে রওনা হয়ে পড়লো দুই কিশোর। ঘাট থে ছোট একটা নৌকা নিয়ে বেয়ে চললো।

সুড়ঙ্গ মুখের কাছাকাছি এসে নৌকা রাখলো টম। এই মুখ দিয়েই বেকি নিয়ে বেরিয়েছিলো সে। গাঁইতি-কোদাল আর ব্যাগ নিয়ে নেমে এলো দু কিশোর। ঢুকে পড়লো সুড়ঙ্গে।

মোমের আলোয় পথ দেখে দেখে এগিয়ে চললো দুজনে। ধীরে ধীরে স হয়ে এলো সুড়ঙ্গ। এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালো টম। একদিকে বাঁ নিয়েছে সুড়ঙ্গ। বাঁকের কাছে পড়ে আছে একটা পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি মাটিতে বিছিয়ে থাকা চুনাপাথরে বড় বড় পায়ের ছাপ।

'হাক, এ-পথেই যাবো আমরা। নিশ্চয় জো-র পায়ের ছাপ।'

আরো খানিকটা এগিয়ে একটা ক্রস দেখতে পেলো ওরা।

'ওই যে ক্রস!' চেঁচিয়ে উঠলো টম। 'এটাই দুই নম্বর। কাছাকাছিই কোথা মোহরের বাক্স রেখেছে জো! চল খুঁজি।'

'টম, আমার ভয় করছে! চল পালাই! কে জানে, কাছেপিঠেই ঘোরাফে করছে কিনা জো-র প্রেতাত্মা! জ্যান্ত থাকতেই যা হারামি ছিলো! মরে নিশ্চয় এখ আরো খারাপ হয়েছে! দেখতে পেলেই ঘাড় মটকে দেবে!'

'না, হাক। মোহরগুলো না নিয়ে যাবো না আমি। আয়, খুঁজি। কাছেপিঠে কোথাও আছে নিশ্চয়!'

খুঁজতে শুরু করলো ওরা। জায়গাটা বেশ প্রশস্ত, একটা গুহামতো চারপাশের দেয়ালে কয়েকটা সুড়ঙ্গমুখ। ওগুলোর কোনোটার ভেতরই আ মোহরের বাক্স, অনুমান করলো টম।

তিনটা সুড়ঙ্গ খুঁজে দেখলো ওরা, পেলো না। যেটাতে ঢুকবে না ভেবেছিলে শেষে সেই সরু সুড়ঙ্গটাতেই ঢুকে পড়লো দুজনে। এগিয়ে চললো। খানিক পরে প্রশস্ত হয়ে এলো পথ। আরেকটু এগিয়েই থেমে গেল। সামনে নেমে এসে পাথরের দেয়াল। দেয়ালের গোড়ায় বড় একটা পাথর পড়ে আছে।

এগিয়ে গিয়ে পাথরটা পরীক্ষা করলো টম। চুনাপাথরে হাতের ছাপ লে আছে।

দুজনে মিলে অনেক কসরৎ করে সরিয়ে ফেললো পাথরটা। তলায় আল মাটি, সদ্য খোঁড়া হয়েছিলো। আবার খুঁড়তে লাগলো দুজনে। শিগগিরই বাে ডালায় বাড়ি খেলো গাঁইতির ফলা।

মাটি খুঁড়ে বাক্সটা বের করে আনলো টম আর হাক। ডালা তুলতেই মোমে আলোয় চক চক করে উঠলো সোনার মোহর।

খুশিতে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলো দুই কিশোর।

বাক্সটা ভারি, দুই কিশোরের পক্ষে বয়ে আনা সম্ভব না। ব্যাগের অন্যান্য জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে তাতে মোহর ভরতে লাগলো দুজনে। তারপর গিয়ে ব্যাগ রেখে এলো নৌকায়। বাক্সটা আধখালি হয়ে গেছে। এবার আর বয়ে নিতে তেমন অসুবিধে নেই। ধরাধরি করে এনে নৌকায় তুললো দুজনে।

সন্ধ্যা হয় হয়। তাড়াতাড়ি নৌকা বেয়ে চললো দুজনে। মন খুশিতে ভরা।

নদীর ধারে একটা নির্জন জায়গায় এনে নৌকা বাঁধলো দুজনে। ধরাধরি করে নামালো বাক্স আর ব্যাগ। ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রেখে ফিরে এসে বসলো নৌকায়। বেয়ে নিয়ে চললো। আবার আগের জায়গায় ঘাটে এনে বাঁধলো নৌকাটা। তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে পৌঁছুলো মিস্টার জোনসের বাড়িতে। একটা ছোট ঠেলা চাইলো।

ঠেলা দিয়ে কি হবে, বুঝতে পারলেন না মিস্টার জোনস। ছেলেদের খেয়াল, ভাবলেন। দিয়ে দিলেন একটা ঠেলা। তারপর বললেন, 'যেখানেই যাস, ফিরে আসিস তাড়াতাড়ি। উইডো ডগলাসের বাড়ি যাচ্ছি, তোরাও ওখানেই আসিস। পার্টি দিচ্ছেন উইডো। তোদেরকেও দাওয়াত করেছেন। তোরা এলে তোদেরকে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

ঠেলা নিয়ে ঝোপের কাছে ফিরে এলো দুই কিশোর। আরেকটা ব্যাগ নিয়ে এসেছে। বাক্সের অবশিষ্ট মোহরগুলোও দ্বিতীয় ব্যাগে ভরে ঠেলায় তুললো ওরা। দুই ব্যাগ মোহর নিয়ে সোজা চলে এলো উইডো ডগলাসের বাড়িতে।

ব্যাগ দুটো লুকিয়ে রেখে ঘরে এসে ঢুকলো দুজনে। হলঘরে গাঁয়ের গণ্যমান্য লোকের ভিড়। হাক আর টম ঢুকতেই ফিরে চাইলো।

ছুটে এলেন উইডো ডগলাস। দুজনকেই চুমু খেলেন। ছেলেদের ময়লা হাত-পা দেখিয়ে বললেন, 'জলদি ভালো করে ধুয়ে এসো। তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি আমরা।'

ওপর তলায় চলে এলো দুজনে। হাক বললো, 'ওই সব লোকের সামনে সঙ সাজে থাকতে পারবো না আমি, টম। চল, সময় থাকতে পালাই। জানালা দিয়ে লাফিয়ে নেমে হাওয়া হয়ে যাই।'

ঠিক ওই মুহূর্তে ঘরে এসে ঢুকলো সিড। টমের ময়লা কাপড়ের দিকে চেয়ে বললো, 'টম, কোথায় ছিলি? সেই তখন থেকে খুঁজছেন তোকে পলি খালা। তোর জন্যেই আসতে দেরি হলো আমাদের।'

জবাব দিলো না টম। নীরবে হাতমুখ ধুতে লাগলো। ধোয়া শেষ করে ফিরে তাকালো সিডের দিকে। 'উইডো ডগলাস পার্টি দিচ্ছে কেন, জানিস কিছু?'

'মিস্টার জোনসের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে। সে-রাতে রেড জো-র হাত থেকে উইডোকে রক্ষা করেছেন মিস্টার জোনস। আসলে কিন্তু তা নয়। গাঁয়ের লোক সবাই জেনে গেছে এখন।'

'কি জেনেছে?'

'আসলে হাক জোকে অনুসরণ না করলে বাঁচতেন না উইডো। হাকই ডেকে এনেছে মিস্টার জোনসকে।'

'কে বলেছে ওদের?' জানতে চাইলো হাক।

'সিড বলেছে,' বলেই ধাঁ করে সিডের পায়ে লাথি মারলো টম। 'কথা বা বলতে ওস্তাদ তো। যা, গিয়ে এখন তোর আদরের পলি খালাকে বল, মেরেছে।'

ছুটে পালালো সিড।

'খামোকা মারলি। ভালো করেই জানিস, ঠিকই বলেছে সিড,' বল হাক।

'ঠিকই করেছি। অনেকদিন থেকেই একটা মার পাওনা ছিলো। সু পেয়েছি, উশুল করেছি। চল যাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'টম, তুই যা। আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'দূর বোকা! ও কিচ্ছু না। শিগগিরই শেষ হয়ে যাবে। তারপর শুধু খা আর খাওয়া।'

হাককে নিয়ে এসে হলে ঢুকলো টম।

ভিড় আরো বেড়েছে। সবাই এসে হাজির হয়েছে মেহমানরা। গমগম ক বিরাট হলঘর।

টম আর হাককে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার জোনস। সবাইকে করতে বললেন।

চুপ হয়ে গেল সবাই। তাদেরকে সব শোনালেন মিস্টার জোনস। কি রেড জোকে অনুসরণ করেছে হাক। কি করে ছুটে এসে খবর দিয়েছে তাঁকে। করে উইডো ডগলাসকে রক্ষা করেছেন তিনি আর তাঁর ছেলেরা।

তেমন চমকালো না জনতা। আসলে, এই কাহিনী আগেই জেনে সবাই। জ্বরের সময় কথায় কথায় উইডো ডগলাসকে বলে ফেলেছিলো হা কথাটা চেপে রাখতে পারেননি উইডো। পলি খালাকে বলে ফেলেছিলেন। ব তারপর আর গোপন থাকলো না গোপন কথাটা। হঠাৎ খবরটা শুনিয়ে লোব চমকে দিতে গিয়ে নিরাশ হতে হলো মিস্টার জোনসকে। আশ্চর্য! ভাব তিনি। সারা গাঁয়ের লোকে খবরটা শুনলো, অথচ তিনি শুনলেন না ওদের মু উহ্‌হো, তিনি যে জানেন গাঁয়ের লোকে তো জানেই। তাঁকে আর শোনাতে আ কেন।

হাকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন উইডো ডগলাস। তাকে কাছে টেনে নি সস্নেহে বললেন, 'হাক, তুই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিস। এখন থেকে তুই আ কাছেই থাকবি। আমার ছেলে হয়ে। তোকে মায়ের আদর দেবার চেষ্টা কর আমি। স্কুলে ভর্তি করে দেবো। আমার যা সহায়-সম্পত্তি আছে, অর্ধেক তো দিয়ে দেবো। আর কোনদিন ভিক্ষে করে খেতে হবে না তোকে।'

'আপনি জায়গা না দিলেও ওকে আর ভিক্ষে করতে হতো না,' জোরে ঢো বললো টম। 'ও এখন মস্ত ধনী।'

'মানে!' অবাক হলেন উইডো ডগলাস।

'দেখাচ্ছি। হাক, আয় আমার সঙ্গে।'

মেহমানদের অবাক দৃষ্টির সামনে দিয়ে হাককে নিয়ে বেরিয়ে গেল টম। ফিরে এলো খানিক পরেই। দুজনে ধরাধরি করে নিয়ে এসেছে একটা ব্যাগ।

'কি ওতে?' জানতে চাইলো উইডো ডগলাস।

'আসুন, দেখাচ্ছি,' ডাকলো টম।

হাক আর টম ধরাধরি করে ব্যাগটা টেবিলে তুলে রাখলো। সবাই এসে টেবিল ঘিরে দাঁড়ালো। ব্যাগের মুখ খুললো টম। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলো একমুঠো মোহর। ছড়িয়ে দিলো টেবিলে। ঝনঝন শব্দ তুললো সোনার মোহর।

'এমন আরো এক ব্যাগ আছে,' জানালো টম। 'অর্ধেক হাকের, অর্ধেক আমার।'

স্তব্ধ হয়ে গেছে দর্শকেরা। দীর্ঘ এক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না। শেষে একজন বলে উঠলো, 'কোথায় পেয়েছো, টম, শোনাও আমাদের।'

সব শোনালো টম।

অনেক রাতে শেষ হলো পার্টি।

উনত্রিশ

কয়েকটা দিন তুমুল হৈ-চৈ গেল সারা গাঁয়ে। অন্য কাজ ফেলে গাঁইতি-কোদাল নিয়ে বেরোলো অনেকেই। খুঁড়ে খুঁড়ে বড় বড় গর্ত করে ফেললো জায়গায় জায়গায়। কিন্তু বৃথা। হাক বা টমের মতো গুপ্তধন পেলো না ওরা। হতাশ হয়ে ফিরে এসে আবার যার যার কাজে মন বসালো।

ছুটি শেষ হয়েছে। আবার দল বেঁধে স্কুলে যায় ছেলেমেয়েরা। নতুন একজন ছাত্র জুটেছে ওদের সঙ্গে। হাকলবেরি ফিন।

হাকের এসব ভালো লাগে না। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে সে, সারাক্ষণই বিষণ্ন। মুখ ভার করে থাকে। নতুন জীবন তার মোটেই পছন্দ না।

মায়ের মতোই তাকে আদর করেন উইডো ডগলাস। কিন্তু এতে অস্বস্তি আরো বাড়ে হাকের। সকাল সকাল বিছানা ছাড়তে হয় এখন তাকে। হাত-মুখ ধুতে হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকতে হয়। খেতে হয় ছুরি-কাঁটা দিয়ে। মিশতে হয়, ভদ্রভাবে কথা বলতে হয় অনেক গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে। একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে তার।

কোনমতে তিনটা সপ্তাহ উইডো ডগলাসের বাড়িতে কাটালো হাক। তারপর পালালো।

খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ! কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না হাককে। শেষে টমকে ধরলেন উইডো ডগলাস।

হাককে খুঁজে বের করলো টম। গাঁয়ের শেষ প্রান্তে একটা খামার বাড়ি খড়ের গাদায়। আরামসে শুয়ে শুয়ে মহা আয়েশ করে পাইপ টানছে হাক কাপড়-চোপড় ময়লা। হাতে-মুখে বালি। কিন্তু সুখী। টমকে দেখেই হাসি একান ওকান হলো।

'হাক,' বললো টম। 'বাড়ি ফিরে যেতে হবে তোকে। এভাবে দিন কাটাতে পারবি না তুই। এখন তুই ধনী। তাছাড়া কেঁদেকেটে দানাপানি ছেড়েছেন উইডো ডগলাস।'

'আমি যাবো না,' সাফ জবাব দিলো হাক। 'ওই জীবন আমি ঘেন্না করি রোজ কাপড় বদলাতে হয়। গোসল করতে হয়। পরিষ্কার রাখতে হয় হাত মুখ। চুল আঁচড়াতে হয়। আমাকে পাইপ খেতে দেয় না উইডো। রাতে বেরোতে দেয় না। স্কুলে যেতে বাধ্য করে।'

'তবু তোকে যেতেই হবে, হাক,' গম্ভীর হয়ে বললো টম।

'না যাবো না। আমার আগের জীবনই পছন্দ। কক্ষনো আর উইডো বাড়িতে ফিরে যাবো না আমি!'

'শোন, হাক। সব ছেলেকেই পরিষ্কার কাপড় পরতে হয়। স্কুলে যেতে হয় আমিও তো তাই করি।'

'করগে। আমি সবার মতো না। সবার মতো আমাকেও হতে হবে সেটা আমি মনে করি না। স্বাধীন থাকতেই চাই আমি। যা ইচ্ছে করবো, কেউ বাধা দেবার নেই। ওই বিরাট বাড়ির চার দেয়ালের ভেতর দম আটকে যেতে চায়...'

'তাহলে যাবি না তুই?'

'না।'

'ঠিক আছে, আমি চলি। নতুন একটা দল গড়ার কথা ভাবছি। ডাকাতের দল। রবিন হুডের মতো। লোককে আক্রমণ করবো হঠাৎ করে, লুট করবো। সব বিলিয়ে দেবো গরীবের মাঝে। কিন্তু আমার দলে কোনো নোংরা ছেলে থাকবে না। ভালো ভালো সব ছেলেরা থাকবে–স্কুলে যায়, পরিষ্কার কাপড় পরে থাকে যারা। কোনো মূর্খ থাকবে না আমার দলে। লোকে যাতে বলতে না পারে; ওই যাচ্ছে মূর্খদের দলের সর্দার টমাস সয়্যার! তার মানে, আমার দলে আসতে পারছিস না তুই। চলি, হাক।'

'দাঁড়া, টম, শোন!' ডাকলো হাক। উঠে বসেছে।

'কি?' ঘুরে চাইলো টম।

'আমাকে দলে নিস, টম!' অনুনয় ঝরলো হাকের গলায়।

'দুঃখিত, হাক। আমার নেয়ার খুব ইচ্ছে। কিন্তু ওই যে বললাম, নোংরা মূর্খ লোক দলে নেবো না।'

নীরবে কি যেন ভাবলো হাক। তারপর উঠে দাঁড়ালো। 'ঠিক আছে, ফিরে যাবো। আরেকবার চেষ্টা করে দেখবো, ভালো হতে পারি কিনা। কিন্তু কসম খা আমাকে দলে নিবি।'

'ঠিক আছে, কসম খাচ্ছি। কিন্তু তোকেও কসম খেতে হবে, আর বাড়ি থেকে

পালাতে পারবি না।'

'থাকতে চেষ্টা করবো, টম,' বললো হাক। 'আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো। সারাদিন তো বাড়ি থাকতে হবে না। খেলতে বেরোবো তোদের সঙ্গে। তখন পাইপ টানতে পারবো চুটিয়ে,' কাছে এসে টমের কাঁধে হাত রাখলো হাক। 'হ্যাঁ-রে টম, রবিন হুড সাজবে কে?'

***